পাবে, কিন্তু তদ্দ্বারা লোকের হৃদয় আকৃষ্ট হয় না। 'বসবাই' গোলাপের অপূর্ব্ব বর্ণনায় লোক কাব্যরস সম্ভোগ করিতে পারে—কল্পনার কমনীয় ভাব ভোগ করিতে পারে, কিন্তু তাহার শোভা ও সৌন্দর্য্য সম্ভোগ-লিপ্সা তাহাতে মিটে না।

সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী উত্তম বা অধম আদর্শের অধীন হিন্দুসমাজে কালবশে অবরোধ প্রথা প্রচলিত হয়। সর্ব্বত্র না হইলেও মুসলমান-আধিপত্য বিস্তার ক্ষেত্রে অবরোধের প্রবল প্রতাপ আজিও বর্ত্তমান। এই অবরোধ বহুল হিন্দু সমাজের পক্ষে স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রী শিক্ষার উত্তম ফল কি ফলিয়াছে এবং ব্রাহ্মসমাজরূপ সূতিকাগৃহে নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষা কিরূপ ভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহার বিশদ আলোচনা নাই কেন? ব্যক্তি বিশেষে বা পরিবার বিশেষে ইহার অপব্যবহার হইলে ভয় পাইবার কোন কারণ দেখি না। সমবেত ব্রাহ্মমণ্ডলীর পারিবারিক জীবনে যদি সে ফল আশাপ্রদ, সুখকর ও সুন্দর হইয়া থাকে, আর যদি সেই উত্তম ফলের প্রতি আপনার ইতিহাস সাধারণ-জনমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণের কেন্দ্র না হইল, যে নূতন পারিবারিক জীবন গঠন জন্য ব্রাহ্মগণকে এদেশের লোকের হাতে নানাপ্রকারে নির্য্যাতনগ্রস্ত হইতে হইয়াছে ও এখনও হইতেছে, তাহার উত্তম ফলের প্রতি আপনার ইতিহাস নীরব দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। আপনি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে বহু বহু বার বলিয়াছেন, জীবনের ও সংসারের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে পুরুষ এবং রমণী মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে সংসারে ও সমাজে উত্তম ফল ফলিবে, কই আপনার ইতিহাসে তাহার আলোচনা নাই কেন? নামোল্লেখ না করিয়াও স্বর্গীয় প্রসন্নময়ীর উদার স্নেহ মমতার কথা, হেমলতার বাল্য-জীবনের ক্রম-বিকাশের কি আপনার স্মরণ-পথে উদিত হয় নাই? আপনার নিজের নামোল্লেখ না করিয়া আপনার ব্রাহ্মগার্হস্থ্য জীবনে—আপনার গৃহে গৃহিণীপনার গুণে যে কত বালিকা ও রমণী স্থান পাইয়া লালিত পালিত হইয়াছে, এবং স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের তদানীন্তন কালের উদার পরিবারিক জীবন, স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেবের গার্হস্থ্য জীবনের পরিপাট্য, বসু-পরিবারের বিদ্যানুরাগ ও অন্য অসংখ্য পরিবারের উচ্চ আদর্শ ও পারিবারিক জীবন কি আপনার সম্মুখ হইতে কেহ ইতিহাস রচনা কালে অপহরণ করিয়াছিল? তাহার পর আপনার ন্যায় উচ্চ পদস্থ ব্রাহ্মের রচিত ইতিহাসে স্ত্রী-শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে কি একটা সুসঙ্গত সমালোচনা প্রত্যাশা করিলে অন্যায় হয়? ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসরের পর বৎসর কে সভাপতি, সম্পাদক ও ধনরক্ষক হইয়াছেন, তাহারই অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর বিবরণমালায় আপনার দ্বিতীয় খণ্ডের অনেকাংশ অকারণ পূর্ণ হওয়ায় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে। আজ কালকার দিনে ইহাই যদি ইতিহাস নামের যোগ্য হয়, আর তাহাই আবার আপনার ন্যায় বিদ্বান সাধুপুরুষের লেখনীর ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা মৃত বা অকর্ম্মণ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও বিবেচনায় তবান এই পুস্তকের প্রচার বন্ধ হওয়া উচিত ছিল। আমাদের সমাজ জীবিত, সুস্থ ও সবল হইলে, কখনই আপনি এরূপ কার্য্য করিয়া সহজে নিস্তার পাইতেন না। অনেকের

মুখে শুনিতে পাই যে, আপনি এই ইতিহাস লুচনা করিয়া সমাজের সমূহ ক্ষতি করিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু কেহই মুখ ফুটিয়া এ কথা বলিতে চান না, এরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কারণ কি? আমার মনে হয়, আমাদের উচ্চ আদর্শ সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়িতেছে, তাই সাহসে কুলায় না। যে কারণে কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ গঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল, আর তখন সমাজে যে শক্তি ছিল, আজ তদনুরূপ কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, সে উচ্চ আদর্শ সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাই সমাজের লোক বুঝিয়াও নীরব! এখন ব্রাহ্মেরা বলেন, এ সকল কথা সাধারণ-জনমণ্ডলীকে জানিতে দিয়া কি লাভ? কিন্তু কেশবচন্দ্রকে ভাঙ্গিবার সময় এই শ্রেণীর সাধুপুরুষগণের দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় নাই। আমি চিরদিনই কিছু দুঃসাহসিক, তাই এই অবসন্ন দশায় মৃত্যু-মুখেও আমার এক বিন্দু সাহস আছে।

আপনি আপনার গ্রন্থে ব্রাহ্ম-পরিবার গঠনের সূত্রপাত, স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ও ক্রমোন্নতি সহকারে উচ্চশিক্ষার সূত্রপাত, প্রাথমিক মহিলা উপাধিধারিণীদের অধ্যবসায় ও সাফল্য লাভ ইত্যাদি বিষয়ে একটীও বাক্য ব্যয় করেন নাই কেন? এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অগ্র-গমনে তৎপরতা দেখাইতে গিয়া ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমহিলারা শত প্রকারে নির্য্যাতনগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কত প্রকার ভিত্তিশূন্য কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া জনসমাজে বিচরণ করিতে হইয়াছে, তাহাও কি অবগত নহেন? ইতিহাসে সাধারণ ভাবে এ সকল বিষয়ে আপনার লেখনী চালনার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, কিন্তু নিতান্ত নিরাশ হইয়াছি।

তাহার পর আজকাল মহিলাদের স্বাধীন ভাবে বহুকর্ম্মে হস্তক্ষেপ ও সে সকল কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ, এমন কি দেশের পক্ষে, দেশের সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত লোকমণ্ডলীর পক্ষে, বিশেষভাবে গৌরবের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং সংবাদ পত্রাদিতেও সে সকল বিষয় গৌরবসহ উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে, এমন অবস্থায়, এইরূপ স্বাধীন ভাবে বিচরণের সূত্রপাত কিরূপে হইল, কোন্ কোন্ মহৎব্যক্তির সৎ সাহসের ফলে মহিলাগণের এতাদৃশ বিচরণ ক্রমশঃ সহজ-সাধ্য হইয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে শ্রম স্বীকার করিলেন না কেন? যে সকল অনাবশ্যক ও অবান্তর বিষয়ে পুস্তক পূর্ণ করিয়াছেন, সে হিসাবে কি হিন্দু মহিলার সর্ব্ব প্রথম বিলাত-যাত্রাটা ইতিহাসের বিষয় নহে? ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে একাধারে বহুকর্ম্মানুষ্ঠানে রত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে ১৮৭১ খ্রীঃ সপরিবারে বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের বরাহনগর বিবরণের মধ্যে সংবাদটীর উল্লেখ মাত্র করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া রাজকুমারী দেবী হিন্দু-মহিলাগণের সমক্ষে সর্ব্বপ্রথম যে এই সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, মোটর ও গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি যানারোহণে পটু ও মরদানে বায়ু-সেবনব্যাকুল মহিলামণ্ডলীর সমক্ষে কি হিন্দু মহিলার বিলাতযাত্রা, রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রার ন্যায় একটা অভাবনীয় উচ্চ দৃষ্টান্ত নহে? এই স্বর্গীয়া রাজকুমারী দেবীর, ও সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের মহিলাগণকে সর্ব্বপ্রথম সেনেট সভার কন্‌ভোকেসনে লইয়া যাওয়া ইত্যাদি কার্য্যে সে সময়ে সমাজে ঘোর আন্দোলন ও আলোচনা উপস্থিত করিয়াছিল। তাহা কি

আপনি বিদিত নহেন? এই সকল বিষয় আপনার ইতিহাসে স্থান পাইবার উপযুক্ত মনে করিলেন না, আর শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী "helps her husband in keeping up the Sylhet Brahmo Somaj" একটা বৃহত্তর সংবাদে পরিণত হইল। ইহা কি খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? বলা বাহুল্য যে,হেমন্তকুমারী আপনার স্নেহের পাত্রী, এরূপ স্নেহের পাত্রী আপনার আরও অনেক আছেন। তাঁহারাও কি তাঁহাদের স্বামীদের ব্রাহ্মসমাজ রক্ষায় সহায়তা করেন না? আপনি ইচ্ছা করিলে শ্রীমতী হেমন্তকুমারী সম্বন্ধে ইহাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের আলোচনা করিতে পারিতেন, তাহাই বা না করিবার কারণ কি?

আজকাল "ডিপ্রেস্‌ট্ ক্লাশ মিশন" বলিয়া সমগ্র দেশে একটা হুজুগ চলিয়াছে। যদি এটা হুজুগ না হইয়া একটা বিশেষ কাজ বলিয়া স্বীকার করেন, এবং এই অনুষ্ঠানে যখন অপর দশজনের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজকেও যোগ দিতে দেখিতেছি, ও ইতিপূর্ব্বেও অনেক সময় এদেশের অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সময়ে সময়ে কিছু কাজ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে এ দেশের সমগ্র ভদ্রমণ্ডলী এবং ব্রাহ্মসমাজের সমবেত-জনমণ্ডলী শ্রীযুক্ত বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট নিরক্ষর লোকদের মধ্যে কাজের সূত্রপাত এবং এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিয়া আসার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞ হইবে! ইহাও বরাহনগর বিবরণের মধ্যে নামমাত্র উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এজন্য শশীপদ বাবুকে যে কি অশেষ বিধ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, এমন কি বিরুদ্ধ-পক্ষের কৃপায় হাজতবাসও করিতে হইয়াছিল, সে সকল উত্তম বিবরণ আপনি সাধারণ ভাবে আলোচনা করিলেন না কেন? খাসিয়া মিশন যদি ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক কার্য্যবিশেষে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ১৮৬৬ খ্রীঃ বরাহনগরে শ্রমজীবী সম্প্রদায় গঠন এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সন্নীতির প্রচার যে এরূপ কার্য্যের প্রারম্ভ কাল এবং এই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের জন্য, ইহাদের নানাবিধ উন্নতি সাধন জন্য এই সার্দ্ধশতাব্দীব্যাপী অর্থব্যয়, শ্রমস্বীকার যদি আপনার ইতিহাসের অযোগ্য হইল,তবে ব্রাহ্মসমাজের এ বিভাগের কার্য্য কলাপের আরম্ভ কোথায় নির্দ্দেশ করিলেন? বরাহনগরে শ্রমজীবীদের জন্য "ভারত-শ্রমজীবী" বলিয়া একখানি সংবাদ-পত্রও বহুদিন ধরিয়া বর্ত্তমান ছিল, সেকালে আপনি নিজে এই সংবাদপত্রে শ্রমজীবীদের উন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন। মাঘোৎসবের সময় বৎসরে বৎসরে ইহাদিগকে "শ্রমজীবী ভাই" বলিয়া আদর অভ্যর্থনাও করিয়া থাকেন। আর ইতিহাস লেখার সময়ে এই শ্রেণীর লোকমণ্ডলী ও তাহাদের দীর্ঘকাল স্থায়ী সমিতিটী ও তাহার কার্য্যকলাপ স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য বলিয়া মনে করিলেন না, নামোল্লেখ মাত্রই সার!

একাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা যোগ দিয়াছেন,তাঁহাদের শতকরা নিরানব্বই জনই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থজাতি হইতে সমাগত। এরূপ স্থলে যে বরণীয় হৃদয় সর্ব্বপ্রথম লোকহিতৈষণা-বৃত্তি-পরিচালিত হইয়া এই সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছে ও তাহার শ্রীবৃদ্ধি লাভে সহায়তা করিয়াছে, সেই সকল বিবরণের বিশ্লেষণ ও মহোপকারিতা লিপিবদ্ধ হইল না; অথচ বৎসরের পর বৎসর যাঁহারা সমাজের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াও বৎসরের মধ্যে নয়মাস অনুপস্থিত, সেইসকল কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধুগণের

নামাবলী মুদ্রিত করিতে আপনি কি ক্লেশই না ভোগ করিয়াছেন। এমন কর্ম্মচারিবৃন্দের নাম আপনার ইতিহাসে দেখিলাম, যাঁহারা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া বৎসরে একবারও আসিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আপনার ইতিহাসের রচনা পদ্ধতি ও কার্য্যের বিচিত্রতা দর্শনে দুঃখিত হইয়াই এই সকল কথা বলিতে হইল। এ সকল ত ভাল, ইহা অপেক্ষাও যে আপনি অনেক অধিক পরিমাণে ভক্তবৎসল হইয়া অনেকগুলি অন্যায় কাজ করিয়াছেন, সেগুলির আলোচনা এখনও হয় নাই, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে আমার একটু সময় লাগিবে, আমিও পীড়িত ও অনেক দিন ধরিয়া অসুস্থ, তাই সেগুলি পরে সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি।

প্রণত শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্মবীর ভয়সী।

ইংলণ্ডের আর একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। যখন আমি বলিলাম, 'আর একটী' তখন স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, ইহার অন্তরালে পূর্ব্বসংঘটিত পতন লেখনীর সম্মুখে এরূপে অবস্থিত আছে যে, অগ্রে তাহার উল্লেখ না করিলে উহা কোনও মতে অগ্রসর হইতে পারিবে না। সে নক্ষত্র দীনবন্ধু, পতিতপাবন উইলিয়ম্ টমাস্ ষ্টেড। উভয়ই পরহিত-ব্রতী ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ম্মযোগী। উভয়ই পুত্রপরিবার পরিবেষ্টিত-গৃহী, কিন্তু উভয়ই পার্থিব—ঐহিক-সুখ ধ্রুবতারা—গৃহী নহেন। উভয়ই ঈশ্বরের পরিবার-ভুক্ত, উভয়েরই চক্ষে পুত্র-কলত্র সার্ব্বভৌম প্রেমের নিম্নতম প্রথম সোপান মাত্র। উভয়ই সার্ব্বভৌম-প্রেমে উভয়ের সন্নিধানে আকৃষ্ট, উভয়ই দুশ্ছেদ্য সহানুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক কেন্দ্রীভূত—স্বদেশ-সেবা, রাজভক্তি, পরহিত-ব্রত, দুর্ব্বলের পক্ষাবলম্বন, কুসংস্কার ও দুর্নীতি দূরীকরণ। উভয়ই স্বাধীনচেতা, নির্ভীক ও সুপণ্ডিত; কিন্তু একজন, বাগ্মী-বাহক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক, অপর ইংরাজী সাহিত্যালোকিত জগৎবিখ্যাত ধর্ম্মোপদেষ্টা। ইনি আমাদিগের সুপরিচিত চির-সুহৃৎ ক্লেভারেণ্ড চার্লস্ ভয়সী।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮ই মার্চ্চ তারিখে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন মহানগরীতে চার্লস ভয়সীর জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম এন্সলে ভয়সী। এন্সলে স্থপতি ছিলেন। চার্লস্ তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। মাতার নাম ফ্রান্সেস্ মেরিয়া; হেরিস্ ফার্কার কোম্পানীর ব্যাঙ্কের অংশীদার রবার্ট এড্‌লিনের কন্যা। পুত্র ও কন্যায় আট—চারি পুত্র ও চারি কন্যা। বাল্যাবস্থায় ষ্টক্ ও এলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তথাকার অধ্যয়ন শেষ করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের "সেণ্ট এডমণ্ড" হল কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এস্থলে একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য, সুতরাং তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, আশা করা যায়। আমাদিগের দেশে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট-বিষয়ে এম্-এ পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে তাহা হয় না। তথায় এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হইতে হয় না। ইহা মর্য্যাদা-সূচক উপাধি-মাত্র। সর্ত্তের মধ্যে এই যে, গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে প্রটেষ্টাণ্ট-মতাব-

লম্বী হইতে হইবে। এই কারণে, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী বিভাগের বিদ্যালয়-সমূহের পরিদর্শক ও বঙ্গদেশের প্রতিনিধি ডিরেক্টর, বেলিয়ল কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ক্যাথলিক-মতাবলম্বী এ, ডবলিউ গ্যাবেট্ এই উপাধি-বঞ্চিত হন। ভয়সীও তাহাই হইয়াছিলেন।

তদনন্তর তিনি একেশ্বরবাদিতা সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি St. Mark's White Chapel নামক ভজনা-মন্দিরের উপাচার্য্যের পদে নিয়োজিত হন। এখানে কার্য্য করিতে করিতে (নরকের) অনন্ত শাস্তির বিরুদ্ধে একটী লিখিত উপদেশ প্রদান করাতে উক্ত পদ হইতে স্থানান্তরিত হন। কিন্তু আপনার ধ্রুব বিশ্বাস হইতে পদস্খলিত না হইয়া ধর্ম্মোপদেশাবলী প্রচার দ্বারা কঠিনতম ধর্ম্ম-সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া ঘোর তমসাচ্ছন্ন ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে; বিশ্বাস ও বিশ্বাস-জনিত কার্য্যাবলী হইতে বিরত রাখিতে তাঁহাকে কতভাবে প্রলোভন-প্রদর্শন করিবার কত চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু ঐ যে সবল-হস্ত, যাহাতে লেখনীরূপ তরবারিধারণ করিয়া একাকী ধর্ম্ম-সংগ্রামে জয়লাভ করেন, তাহা ভীমের হস্ত, অর্জ্জুনের লক্ষ্য-প্রণোদিত ঐহিকতা-রূপ পক্ষাঘাতে বিকল হইবার নয়, হয়ও নাই। হৃদয়ে যেমন একদিকে এক অনির্ব্বচনীয় কোমলতা ছিল, দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রস্রবণ ছিল, তেমনি অপরদিকে তাহা অবিচলিত।

হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-প্রধান ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ-প্রধান ধর্ম্ম বলিলে বুঝিতে হইবে যে, অন্য সাধারণের চিন্তার অধিকার নাই, এমন কি বুঝিবারও অধিকারও নাই। উপদেশাবলী সংস্কৃতে। ব্রাহ্মণ আপনাদিগের স্বার্থমত, ইচ্ছামত তৎসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা করিয়া অভীষ্ট-সিদ্ধ করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মেরও অবস্থা তদ্রূপ ছিল। প্রভেদের মধ্যে এই যে, মার্টিন লুথারের অসাধারণ আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস-শক্তিতে উহা ভাষান্তরিত হওয়ায়, সর্ব্বসাধারণে কিয়ৎপরিমাণে আলোকিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও এমন দুর্দ্দশা আছে যে, গোঁড়া-যাজকগণ যাহা বুঝাইয়া দেন, গোঁড়া খ্রীষ্টানগণ তাহাই অব্যর্থ, অভ্রান্ত, ঈশ্বরবাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন; স্বাধীন চিন্তা-শক্তি আদৌ রাখেন না। সুতরাং যখন ১৮৬৫ খ্রীঃ ভয়সী "আমাদিগের স্বর্গস্থ পিতার সম্বন্ধে বাইবেলের প্রত্যেক উক্তি কি সত্য" এই বিষয়ে উপদেশ প্রচার করিলেন, তখন ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-জগতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। ইহা সহসা নির্ব্বাপিত হইল না। প্রত্যুত, "ইংলণ্ডীয় ভজনালয়ে চরম একদেশদর্শীদল (Ultra Orthodox Party in Anglican Church) নামক প্রবন্ধ-প্রকাশে যেন আহুতি পাইয়া আরও ঘোরতর ভীষণবেগে উহা জ্বলিয়া উঠিল। ইয়র্কের আর্চ্চ বিশপ, তাঁহার বিরুদ্ধে নালিস রুজু করিলেন। দুই বৎসর মোকদ্দমার পর বিশপ খরচা-সমেত ডিক্রী পাইলেন, ভয়সীকে পদত্যাগ করিতে হইল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের প্রিভিকাউন্সেলের আপীলের ইহা নিষ্পত্তি। ইয়র্কশায়রের অন্তর্গত হেস্‌লির ভজনা-মন্দিরের সাত বৎসরকাল অধীনস্থ পৌরোহিত্যের কর্ম্ম করেন। ইহার দেড় বৎসরকাল "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" ধর্ম্মবীর জেমেকা দ্বীপে অবস্থিতি করিয়া আপনার সংস্কৃত ধর্ম্মমত প্রচার করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ছয় মাস কিউ-রেটের, অর্থাৎ নিম্নপদস্থ যাজকের কাজ করেন। ১৮৬১ খ্রী- হইতে ১৮৬৩ খ্রীঃ অবধি

সেণ্ট মার্কস হোয়াট চ্যাপেলে এবম্বিধ কার্য্য করিতে থাকেন। এক্ষণে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হার্টফোর্ড কলেজের যিনি অধ্যক্ষ, সেই বেডরেণ্ড বয়ডের অধীনে নর্থ উলিচের অন্তর্গত ভিক্টোরিয়া ডর্ক গির্জ্জার যাজকত্বের ভার তাহার উপর অর্পিত হয়। ইহার পর ১৮৬৪ খ্রীঃ হইতে ১৮৭১ খ্রীঃ অবধি ইয়র্কশায়রের অন্তঃপাতী হিলফের্ডের সাম্প্রদায়িক এলাকাধীন প্রধান আচার্য্যের কার্য্য (Vicar) করিতে থাকেন।

ভগবদ্গীতা-রচিত গ্রন্থাবলী যদিও বড় বেশী নয়, কিন্তু নিতান্ত কমও নয়। সকলই ধর্ম্ম-বিষয়ক ও প্রচলিত খ্রীষ্টীয় মত-বিরোধী ও বিতণ্ডা-সূচক। গ্রে যেমন এক Elegy লিখিয়া জগদ্বিখ্যাত কবিশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হন, ভগবদীয় অন্যান্য পাণ্ডিত্য-পরিচায়ক গ্রন্থ-সত্ত্বেও, এক Religion for all mankind অর্থাৎ 'অখিল মানবজাতির ধর্ম্ম' নামক এক গ্রন্থেই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপিত। তন্মধ্যে অন্যান্যগুলির নাম উল্লেখ করিতেছি—দশখণ্ডে সমাপ্ত The Sling and the Stone (১৮৬৬—৯৩), জরা, মৃত্যু ও পাপ রহস্য (Mystery of Pain, Death and Sin) যে কি রূপ উচ্চ অঙ্গের পুস্তক, তাহা নামেই জানা যাইতেছে। ইহার পক্ষে বলিবার আমার কিছুই নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রের, যিনি পরকাল ভাবেন, ইহা অবশ্য-পাঠ্য। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নাস্তিক মত খণ্ডন করিয়া তিনি যে যুক্তিযুক্ত প্রসঙ্গাবলী প্রকাশ করেন, তাহা নাস্তিক ও আস্তিক মতের প্রান্তদেশবর্ত্তী যে অপক্ক মস্তিষ্ক আছে, তাহার পক্ষে "Discourses in Refutation of Atheism" যে বহু মহামূল্য নিধি, তাহা লিখিয়া জানাইবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। ১৮৮১ খ্রীঃ The Bible and the Theistic Faith অর্থাৎ বাইবেল্ ও একেশ্বরবাদ বিষয়ক বক্তৃতাসমূহে শেষোক্ত বিষয়ের বিরুদ্ধে New Testamentএ যাহা যাহা উক্ত আছে এবং Old Testamentএ তাহার আনুকূল্যে যাহা যাহা প্রকটিত আছে, তৎ সমুদায় অতি বিশদরূপে প্রতিপন্ন করেন। এক ঈশ্বরবাদী বা এক কথায় ব্রাহ্ম হইতে হইলে যে বিশেষ কোনও বিদ্যা বুদ্ধি পূর্ব্বাভ্যাসের প্রয়োজন নাই, তাহা তাঁহার প্রণীত Theism or Religion of Common Sense (একেশ্বরবাদিতা বা ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধারণ জ্ঞানের ধর্ম্ম) পাঠ করিলেই অনায়াসে বোধগম্য হয়। ইহা ১৮৯৪ খ্রীঃ প্রচারিত হয়। পরবৎসর (১৮৯৫ খ্রীঃ) একঈশ্বরবাদিত্বই স্বাভাবিক ধর্ম্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম Theism as a Science of Natural Theology and Natural Religion) প্রকাশ করিয়া যেমন একদিকে ধর্ম্ম-জগতের বিশেষ উপকার করিলেন, তেমনই অপর দিক হইতে, স্বীয় প্রতিভাবলে, আপনাকে ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ ও বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচয় দিলেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে মথি প্রভৃতি চারিখানি সুসমাচার হইতে প্রমাণ সংগ্রহ (Testimony of the four Gospels concerning Jesus Christ) প্রকাশিত হয়।

সৎকার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বিত হয়। কোন কোন দেশে শব দাহ হইয়া থাকে, কোথা বা সমাধি হইয়া থাকে। এই সাধারণ প্রথা-দ্বয় প্রায়ই সর্ব্বত্রে প্রচলিত ও পরিলক্ষিত। ভারতবর্ষে শবদগ্ধ ও সমাহিত দুই-ই হইয়া থাকে। ইংলণ্ড প্রভৃতি যাবতীয় য়ুরোপীয়

দেশে সমাধিই প্রথা; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তত্তৎ দেশে পণ্ডিত ও গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক দাহ অনুমোদিত। এই জন্য দাহ-সমিতি নামে সেই দেশে এক একটী সভা সংগঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডেও মহাত্মা ভয়সী প্রভৃতি বড় বড় লোকের প্রযত্নে একটী দাহ-সমিতি সংগঠিত হয়, সংগঠিত হইবার পূর্ব্বে ইনি বক্তৃতার দ্বারা এ বিষয়ে সাধারণকে শিক্ষা দান করিতে ও সাধারণের মত পরিবর্ত্তিত করিতে প্রয়াস পান। দুঃখের বিষয়, সমিতির সভ্যগণ এক একজন করিয়া গতাসু হন। একা ভয়সী জীবিত ছিলেন, তিনিও তাঁহার অগ্রগামী যাত্রিগণের প্রদর্শিত পথানুসরণ করিলেন। হারবার্ট স্পেনসার, লর্ড কেলভিন্ প্রভৃতি মহাপুরুষের মত ইঁহার মৃত দেহ দগ্ধ হইয়া থাকিবে। ইংরাজী দাহ-পদ্ধতি কলিকাতাতেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে প্রধান আন্দোলন পাদ্রি সম্প্রদায় হইতে হইয়াছিল। তাঁহারা এখনও এ বিষয়ে স্নিগ্ধ-মস্তিষ্ক হন নাই, কারণ তাঁহাদিগের ধ্রুব-বিশ্বাস, এই ঘৃণিত পদ্ধতিতে ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে। এই বিশ্বাসে মৃতদেহ সমাহিত হইয়া থাকে যে, মৃত্যুর পরলোকে গত ব্যক্তির আত্মা সমাধি হইতে উঠে, সুতরাং সমাধি না হইলে আত্মার এই প্রকার পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নাই। * সুতরাং পাদ্রি-সম্প্রদায় মৃতা পত্নীর ভগিনীর সহিত বিবাহ ইংলণ্ডে বিধিবদ্ধ হইলেও, যেরূপ খড়্গ-হস্ত হইয়া আন্দোলন করিতেছেন, ইহারও বিরুদ্ধে সেরূপ করিবেন, তাহার আর বৈচিত্র্য কি আছে?

সুরাপান-নিবারণী সভার চেষ্টায় ও আমাদিগের সদাশয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ইংলণ্ডে সুরাপায়ী সংখ্যা হ্রাস হইবার আশা করা যায়। শুধু ইংলণ্ডে কেন, আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও ঐরূপ হিতকারী সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। মাননীয় মৃত মহাত্মা শ্যামুএল্ স্মিথ্ ও মাননীয় মহাত্মা শোয়ান-প্রমুখ এংলো ইণ্ডিয়ান্ টেম্পারেন্স সোসাইটি সংস্থাপিত হয়। ইংলণ্ডে এই প্রকার সভা আর আছে কি না, জানি না। যদিও বা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, মৃত মহাত্মা ভয়সী ইহার অন্যতম সভ্য ছিলেন, যদি থাকে, তাহা হইলেও ইহাও বলিতে পারি যে, তিনি এই আপাততঃ অজ্ঞাতনত সভার ও অন্ততঃ অন্যতম সভ্য ছিলেন। ইহার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত কুমারী জোজেফাইন বটলার, মিসেস্ ফসেট প্রভৃতি অনেক ভদ্র-মহিলাও ছিলেন ও আছেন। আমেরিকায় নারীগণের উদ্যমেও কুমারী জেসি একারম্যান প্রমুখ স্ত্রীজাতির একটী সভা আছে। উহার নাম World's Womens' Temperance Society ভয়সী সুরাপায়ীদিগের দুর্দ্দশা ও পরিণাম সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয় হইয়া, সেই নিরাশ্রয় হতভাগ্যদিগের নিমিত্ত যে আশ্রয় সংস্থাপিত হয়, তাহার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার পঁচিশ বৎসর সভ্য থাকিয়া মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন।

সমাজ-সংস্কারের নিমিত্ত সৎসাহস প্রদর্শন করিয়া ষ্টেডকে কারারুদ্ধ হইতে হয়। ধর্ম্ম সংস্কারের নিমিত্ত সৎ-সাহস প্রদর্শন করিয়া ভয়সীর অর্থদণ্ড হয়, পদচ্যুতির কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। এক্ষণে অর্থদণ্ডের কথা সংক্ষেপে লিখিতেছি। তাঁহার বিপক্ষে ধর্ম্ম বিরুদ্ধাচরণ দোষারোপ করিয়া মোকদ্দমা করাতে ইয়র্কের আর্চ বিশপ শ্রদ্ধাস্পদ টম-

* Grant Allens' Evolution of the 'Idea of God'

সনের ৪০০০ পাউণ্ড খরচ হয়। পাদ্রি, অধ্যাপক ও শিক্ষক বরাবরই গরিব। ইঁহারা কোনও যোত্রবান নন। তন্মধ্যে ভবসী কেবল ৫০ পাউণ্ড খরচা বাবং দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাকী বাদীকে চাঁদা করিয়া তুলিয়া মোকদ্দমা চালাইতে হইয়াছিল। তাঁহার কখনও স্বচ্ছল অবস্থা ছিল না। সমাজ হইতে যে আর্থিক সাহায্য পাইতেন, তাহাতে কোনও প্রকারে স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সমাবৃত হইয়া দিনপাত করিতেন। সমাজের অনাটন হইলে, নিজের ও পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণের জন্য যাহা পাইতেন, তাহাও সময়ে সময়ে স্বেচ্ছায় কম করিয়া লইতেন। তথাপি সার্ব্বভৌম প্রেমে প্রেমিক থাকিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ থাকিতেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিলাতে থিইষ্টিক চার্চ্চ বা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দিয়া সাহায্য করেন। কিন্তু মহর্ষির স্বর্গারোহণের পর আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, তিনি এই উপলক্ষে একটী উপদেশ বা sermon দিবেন, যেমন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণের পর (যদিও কিছু অপ্রিয় সত্য প্রয়োগ করিয়া) দিয়াছিলেন। কিন্তু মহর্ষির মৃত্যুর পর কিছুই দেন নাই, মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। মহর্ষির মত মহাত্মাকে তাঁহার মত মহাত্মা যে উপেক্ষা করিবেন, (বিশেষতঃ তিনি যখন আপনি না হউন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ যখন এত উপকৃত) তাহা সম্ভবপর নহে। বোধ হয় বিস্মৃতি। বেদী হইতে প্রদত্ত উপদেশাবলী হইতে তাঁহার রাজনৈতিক ধর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়। তিনি যথাসাধ্য রাজনৈতিক আলোচনা হইতে বিরত থাকিতেন, এবং কাহাকেও সহজে এ বিষয় জানিতে দিতেন না। যাঁহারা তাঁহার সাপ্তাহিক উপদেশগুলি যত্নপূর্ব্বক বহুদিবস হইতে পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই জানেন যে, তিনি উদার-রাজনৈতিক ছিলেন। তাই বলিয়া কি তিনি প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের সকল মতে মত দিয়া চলিতেন বা অনুমোদন করিতেন, তাহা কখনই করিতেন না। তাহার প্রমাণ Lux Mundi সমালোচনায় মন্ত্রীবরকে আক্রমণ ও তাহার কপটাচরণ প্রকাশ করা।

একটী বিষয়ে তাঁহাকে ও তাঁহার বন্ধুবর ষ্টেডে পার্থক্য লক্ষিত হয়। ষ্টেডের অটল রাজভক্তি ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে এমন নির্ভীকতা ছিল যে, তিনি রাজাকেও, যাহা উচিত বলিয়া মনে করিতেন, তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ধর্ম্মবীর ভয়সীরও অটল রাজভক্তি ছিল। তাহার প্রমাণ ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুপলক্ষে ও এডোয়ার্ডের ও পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক বিষয়ে বক্তৃতা। ইনি রাজার অপ্রিয় কোনও কথা কখনও বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীনকুরচন্দ্র বিশ্বাস।

ব্রহ্মবিদ্যা।

"তং হ দেবাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে"।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৬।১৮।

"A hair perhaps divides the False and True,
Yes, and a single Alif were the clue—
Could you but find it—to the Treasure-house,
And peradventure to the Master too"—

Omar Khayyam

মূক যেমন বাচাল হইতে কামনা করে,—অন্ধ চক্ষুষ্মান হইতে চাহে,—পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করিতে বাসনা করে,—দীন-হীন ভিখারী ঐশ্বর্য্যবান হইতে অভিলাষ করে, আমিও তেমনি, এই অপার সংসার-সাগরের তরঙ্গে পড়িয়া, হাবুডাবু খাইতে খাইতে, পাপে তাপে, জরা, মৃত্যু, রোগ শোক কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া, ক্ষীণপ্রাণ বাতাহত তরণীর ন্যায় বিপন্ন অবস্থায় ব্রহ্মবিদ্যা রূপ নিরাপদ ও শান্তিময় বন্দরের দিকে, স্বভাবতই, সতৃষ্ণ নয়নে নেত্রপাত করিতেছি। এক মাত্র আশা এই যে, যে অদৃষ্ট শক্তি আমাকে এই সংসার মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন, তিনিই আমাকে গম্য স্থানে লইয়া গিয়া, জীবন-তরণীখানিকে, নিজ চরণে বাঁধিয়া, চির বিশ্রাম দান করিবেন।

ব্রহ্মবিদ্যা অনুসন্ধান করিবার ইহাই প্রথম কারণ। নচেৎ বিদ্যা বুদ্ধি এমন নাই, যাহাতে ঐ বিষয়ের অধিকারী হইতে পারি।

শিশু, যেমন, চন্দ্রমার দিকে কর প্রসারণ করে, আমিও, তেমনি, এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন জীবনের মধ্যে, সেই দূর হইতে সুদূরে, অথচ অতীব নিকটে, "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে" ১ হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র ব্রহ্মের দিকে, ব্রহ্ম-বিদ্যার দিকে কর প্রসারণ করিতেছি। আশা এই যে, ক্ষুদ্র শিশু, যেমন, মাতৃস্তন্যরূপ অমৃত-ধারার জন্য লালায়িত হইয়া, প্রথমতঃ চঞ্চলভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর প্রসারণ করে এবং ঐ অমৃতের উৎসকে ধরিতে না পারিলে ক্রন্দন করে, কিন্তু একবার সেই অমৃতের উৎস স্বরূপ মাতৃস্তন্য নিজ মুখে প্রযোগ করিতে পারিলে, তাহার চঞ্চলতা, ক্রন্দন প্রভৃতি দূর হয়, এবং সে আপ্তকাম হইয়া, নীরবে, প্রফুল্ল চিত্তে, মধুপানে উন্মত্ত ভৃঙ্গের ন্যায়, মাতৃস্তন্য পানে, অমৃতরসে মগ্ন হয়, তেমনি, আমিও একদিন জগৎ-প্রসবিনী আদ্যা শক্তি ব্রহ্মময়ীর অমৃতস্তন্য খুঁজিয়া পাইব এবং সংসারের অশেষ দুঃখ জ্বালা ভুলিয়া, সেই নিত্যানন্দসাগরে চিরসমাহিত হইব। কারণ তিনি মাতার ন্যায় আমা-দিগকে রক্ষা করিতেছেন।

"মাতের পুত্রান্ রক্ষস্ব।" ১

(১) মুণ্ডকোপনিষৎ। ৩।১।৭।

* এই প্রবন্ধটী ১৯১২, ২৮শে মার্চ্চ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে, ব্রহ্মসংসদের আহ্বানে পঠিত হয়। ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম "ব্রহ্মবাদী" পত্রিকা ও নায়কে প্রকাশিত হয়। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

(১) প্রশ্নোপনিষৎ। ২।১৩।

"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে, সে দিন আসিবে।" ২

এই ব্রহ্মবিদ্যা অনুসন্ধান করিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমার স্বর্গীয় পিতামহদেব ঈশ্বর ভুবনমোহন সিংহ মহোদয়, অশীতিপর বয়সে, আজন্ম নীরোগ দেহে, যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া, দেহত্যাগ কালে, শেষ নিশ্বাসের সহিত, নিজ বংশাবলীর প্রতি শেষ উপদেশচ্ছলে, রায় রামানন্দকৃত পদ্যাবলী গ্রন্থের এই শ্লোকটী উচ্চারণ পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ সাগরে লীন হয়েন—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলম্
জন্মকোটিসুকৃতৈর্লভ্যতে॥"

জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে, পিতামহদেব কর্ত্তৃক উক্ত এবং নিজ বংশাবলীর প্রতি উত্তরাধিকার সূত্রে শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি রূপে প্রদত্ত, এই শ্লোকটী, আজীবন পিতৃদেবের মুখে শুনিয়া, স্বভাবতই ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় অনুসন্ধান করিতে চিরদিনই প্রবল ইচ্ছা জন্মে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৮৩ শকের, ১৮ই চৈত্রের ব্যাখ্যানে ও অন্যত্রে ইহাঁকে "অশেষ গুণরাশি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কি প্রকারে, ইহা সম্ভব হইবে জানিতাম না। আমার পিতৃদেব ঈশ্বর প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয়, সর্ব্বদা হরিপদকমলপীযূষপানে মগ্ন হইয়া, প্রেমবিহ্বলকণ্ঠে গাহিতেন,—

"পাবে না সে ধন, সাধুসঙ্গ বিনে।
সাধু হৃদয় ধন, সে অমূল্য রতন॥
সাধু সঙ্গ কর, সাধু বাক্য ধর।
সহজে মিলিবে, সে বিভু দরশন॥"

(২) শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় পিতা ও পিতামহদেবের প্রদর্শিত অমৃতের পথ অনুসন্ধান করিতে করিতে, বেদান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছি।

যৌবন কালে, ম্লেচ্ছ ভাষার মধ্য দিয়া, নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ তত্ত্ববিদ্যার দিকে দৃষ্টি পড়ে। ক্রমশঃ বৈষ্ণব বংশে জন্মের ফলে, আত্মীয়গণের নিকট হইতে, প্রধানতঃ দুইটী বৈষ্ণব ভাব জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে। উহা এই,—"ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরিবে অন্তরে" এবং "কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে, গুরু অন্তর্য্যামী হয়ে শিখায় আপনে।" ১

বেদান্ত এই কথার সায় দিয়া বলিলেন,—"তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ ব্রহ্মেতি।" ২ এবং "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্।" ৩

এই প্রকারে, নানা শাস্ত্রে, নানা সাহিত্যের মধ্যে, এই অমৃত লাভের পথের অনুসন্ধান করিয়া, শেষে বেদান্ত ও নির্ব্বাণ মধ্যে আসিয়া, জীবনকে মধুময় করিবার উপায় খুঁজিয়া পাইলাম। এখন দেখিতেছি যে, গ্রীক্, হিব্রু, খৃষ্টীয়ান ও ইস্লাম্ শাস্ত্রাদিতে আত্মার আরাম ও আরোগ্য হয় বটে, কিন্তু বেদান্ত মধ্যে যে সুনির্ম্মলা, দুঃখহা, সুখদা ব্রহ্মবিদ্যা, শব্দারণ্যের গূঢ় প্রদেশে, হীরকখনির মধ্যে, যেমন লুক্কায়িত রহিয়াছে, এমন আর কোথাও নহে। এই সুগুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিতে পারিলে, কদাচই আর আত্মার দারিদ্র্য থাকে না। এই সুগুপ্ত উৎস হইতে উৎসারিত মুক্তিধারা, পূতসলিলা জাহ্নবী-

(১) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

(২) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।৩।১।

(৩) ঐ কঠোপনিষৎ।২।২৩। ও অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ।৩।২।৩।

ধারার ন্যায়,—বিষ্ণুচরণনিঃসৃত অমৃত প্রবাহের ন্যায়,—বহুদূরস্থিত অতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া, মানব সমাজকে পবিত্র, উর্ব্বর ও সতেজ করিয়া আসিতেছে।

এই ব্রহ্ম-বিদ্যা উপদেশ করিবার জন্যই হিন্দুঋষিগণ বিশ্বকে আহ্বান করিয়া চলিতেছেন,—"হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা শ্রবণ কর।"১ আহা! এমন মধুর ডাক্, এমন মধুর সম্বোধন আর কোথাও তো শুনি নাই। আর কেবল শৈশবে শুনিয়াছি, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের শ্রীমুখে। তিনি প্রতি প্রত্যূষে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য, আশাবরী রাগিণীতে গাহিতেন,—"জাগো সবে অমৃতের অধিকারী।" কই। এখনও আমার ঘুম ত ভাঙ্গিল না। এতদিনে, সেই অমৃতের কথা বুঝিতেছি ও উপনিষদে পাঠ করিতেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, পিতৃদেব মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়া, নয়নাতীত দেশে চলিয়া গিয়াছেন, নচেৎ প্রাণ ভরিয়া আজ উভয়ে একত্রে সেই "অমৃত" আস্বাদন করিতাম।

উপনিষদের অর্থ রহস্য,—কারণ, ইহার তত্ত্ব সুগুপ্ত। "রহস্যং ব্রহ্ম বিদ্যায়াম্।" ২ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে,—"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্। নাপ্রশান্তায় দাতব্যং পুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ। ৬।২২

ব্রহ্মের ন্যায় এই ব্রহ্ম-বিদ্যাকে,—"গূঢ় মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠমপুরাণম্" ৩ বলা যাইতে পারে।

এই অসীম রহস্য ভেদ করিতে যাইয়া, ঋষিগণ বলিয়াছেন,—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নোন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নোন বেদেতি বেদ চ॥" ১

"আমি মনে করি না যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি। আমি তাঁহাকে জানি না, এমনও নহে। আমি তাঁহাকে জানি, এমনও নহে। ইহাই যিনি বুঝেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।"

এই ব্রহ্মবিদ্যার পথ ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। তাই কঠোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গমপথস্তাৎ কবয়ো বদন্তি॥" ২

"ওঠ। জাগ। শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নিকট গমন কর। ক্ষুরের শানিত ধারের ন্যায় দুর্গম এই ব্রহ্মবিদ্যার পথ, ইহাই যোগিগণ উপদেশ করিয়াছেন।

এই ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা।

"স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্।
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥" ৩

প্রশ্নোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ, যথা মা বো মৃত্যুঃ
পরিব্যথা ইতি॥"৬।৬॥

—"অর সমূহ যেমন রথনাভিতে অর্পিত থাকে, তেমনি কলা সমূহ যাঁহাতে আশ্রিত, সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে তোমরা জান। তাহা হইলে আর মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা দিতে পারিবে না।

পূর্ব্বকালে, বনভূমির মধ্যেই এই ব্রহ্মবিদ্যা আবদ্ধ ছিল। শাক্য সিংহ, এই অমূল্য রত্নকে গুহার অগম্যতার মধ্য হইতে উদ্ধার

(১) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।২।৫।
(২) ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ।২।
(৩) কঠোপনিষৎ ২।১২।

(১) সামবেদীয় কেনোপনিষৎ। ১০।
(২) কঠোপনিষৎ।৩।১৪।
(৩) মুণ্ডকোপনিষৎ। ১। ।১।

করিয়া, জনসমাজে প্রথম প্রচার করেন। আমরা "নির্ব্বাণ" নামক প্রবন্ধে, ইহার আলোচনা করিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্যই যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্যই অরণ্যায়ন বা অরণ্যবাসাত্মক তপ, ব্রহ্মচর্য্যই মৌন,—পশুহনন, বনগমনাদি নহে, ইহা সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে অষ্টম অধ্যায়ে, পঞ্চম খণ্ডে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্লোকে ও ঐ অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ডে উল্লেখ মাত্র থাকিলেও, শাক্য সিংহের পূর্ব্বে জনসমাজ উহার বিষয় তত অবগত ছিল না।

কেবল যে প্রাচীন কালেই লোকের ধারণা ছিল যে সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা হয় না, তাহা নহে। পণ্যশ্লোক রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে তাঁহার শিষ্যগণ একদা জিজ্ঞাসা করেন,—

"একজন ভক্ত—"মহাশয়। সংসারে তাঁকে পাওয়া বড়ই কঠিন দেখ্‌ছি। কটা লোক ও রকম হ'তে পারে? কৈ দেখ্‌তে তো পাই না।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ,—কেন হবে না? ওদেশে শুনেছি একজন ডিপুটী খুব লোক,—প্রতাপ সিংহ,—দান, ধ্যান, ঈশ্বরে ভক্তি অনেক গুণ আছে। আমাকে নিতে পাঠিয়েছিলেন। এই রকম লোক আছে বৈ কি।"১ আমার পিতৃদেব (২) সংসারে থাকিয়াও, সংসারের স্পর্শ হইতে দূরে থাকিতেন। সংসার তাঁহার খোঁজ জানিত না। কিন্তু পরমহংস দেবের দিব্য চক্ষু, তাঁহার জীবনের নিগূঢ় সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছিল! ভক্তরী না হইলে কেহ হীরকের 'পানি' চিনিতে পারে না।

সংসারে থাকিয়াই আমাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা সাধন করিতে হইবে। কারণ, আমরা এখন আর আরণ্যক জাতি নহি, আমরা এখন সামাজিক জীব। ইহা সত্য যে, সমাজে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন কঠিন। কঠিন হইলেও, এবং কেবল নিজেরই জন্য ধর্ম্ম-সাধনের আরম্ভ হইলেও, সমাজ তাহার ফল ভোগ করে। যতই বাধা অতিক্রম করা যায়, ততই অধিক সিদ্ধি লাভ হয়। নির্জ্জনতার মধ্যে প্রতিভার বিকাশ হয় সত্য, কিন্তু সজনতার মধ্যেই চরিত্রের বিকাশ হয়। জার্ম্মন কবি গাহিয়াছেন,—

"নির্জ্জনতায় প্রতিভা এবং সজনতায় চরিত্র বিকাশ প্রাপ্ত হয়।"

বেদান্তের সময়ে প্রব্রজ্যার প্রথা ছিল। এখনও হয়তো তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু কালের ও দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং যাঁহারা বিশেষভাবে প্রতিভার বিকাশ জন্য বনগমনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিবেন, তাঁহাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই অতি অল্প। সাধারণ মানবকে সমাজে থাকিতেই হইবে। অতএব সংসারে থাকিয়াই, গৃহী সন্ন্যাসী হইয়া, ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা করিতে হইবে। আমাদের ইহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে,—

এমন গৃহী সন্ন্যাসী হ'তে হবে,
যে সব সন্ন্যাসী হার মেনে যাবে।

(১) শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ।২।৩।১৫৪ পৃষ্ঠা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী ১৮ নং ও ৪৮ নং দেখ। ইহাতে তিনি বলিয়াছেন, "তিনি আমাদের অশেষ প্রিয় ও ব্রাহ্মরসের আস্বাদন পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন।" ইত্যাদি।

(২) Calcutta University Calender 18 53--4 120--127 Library gold medal Examination পরীক্ষায় দুই জন মাত্র সুবর্ণ পদক পান—আমারপিতা ও স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্র। পিতৃদেব লিখিত ঐ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর ১২০—১২৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। তিনি Senior ও Junior পরীক্ষাতেও সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ইংরাজি অতি উত্তম রূপ জানিতেন। তদ্ভিন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দ্দু, পার্শি, ফরাশি ও লাটীন ভাষাও জানিতেন।

এই ব্রহ্মবিদ্যা অনায়াসে লাভ করা সাংসারিকের পক্ষে অসম্ভব। মোহে অভিভূত হইয়া, ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন থাকিয়া, আমরা কখনই এই পরা বিদ্যার, ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃত অধিকারী হইতে পারি না। আমরা ধন-মদে মত্ত ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়াও,হরিনাম করি,—ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ প্রদান করি, বলিয়াই, অন্ধগণ কর্ত্তৃক অন্ধগণকে চালনার বিষময় ফল লাভ করি। যম বলিয়াছেন,—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥"১

নচিকেতাকে যম বলিতেছেন,—

"মূর্খ হইয়াও যাহারা নিজেকে পণ্ডিত মনে করে,—তাহারা অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায়, নানা পথে, কুটিলভাবে চালিত হয়।

চিন্তাহীন ও ধনমোহে আচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পরলোকের প্রয়োজনীয় উপায় সকল প্রকাশ পায় না। তাহারা ভাবে যে, ইহলোকই আছে ও পরলোক নাই এবং তজ্জন্যই তাহারা পুনঃপুনঃ আমার অধীন হয়।"

সংসারের মধ্যে থাকিয়া, অশেষ প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু নানা কারণে ভণ্ডামী ও কপটতা আসিয়া পড়ে। ইহা ব্রহ্মলাভের অন্তরায়। কারণ ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্ম তাঁহারাই লাভ করিয়া থাকেন, যাঁহাদের মধ্যে কৌটিল্য, অসত্য ও মায়া নাই। "ন যেষু জিহ্মমনৃতং মায়া চেতি।" (১)

সাধনশূন্য,—বাক্‌সর্ব্বস্ব,—ধর্ম্মধ্বজী ব্রহ্মবাদিগণকে লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন—"ইহাদের কথা আর বলিও না। ইহারা অন্ধগণের অন্ধনায়ক। এবং অন্ধগণকে চালনা করিলে যে ফল, তাহাই লাভ করিবে, অর্থাৎ উভয়েই গর্ত্তে পড়িবে।" (২)

ঈশা, নানা স্থানে, আমাদিগের ন্যায় ভণ্ড ও মিথ্যা ব্রহ্মবিদ্যা-প্রচারকগণের প্রতি তীব্রভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন। (৩)

ভণ্ড, সাধন-শূন্য, ধর্ম্মধ্বজী, সংসারী ব্রহ্মবিদ্যা-প্রচারকগণকে সম্বোধন করিয়া, মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন—"হে অন্ধ গুরুগণ! হে কপট কালভুজঙ্গগণ।"(৪) এই কারণেই ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে কিছু বলিতে আমার ভয় হয়।

মহাভারত আমাদিগকে আত্মাভিমান ও আত্ম-প্রতারণা হইতে, সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক, রক্ষা করিবার জন্য বলিতেছেন,—

"যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিমেন কৃতম্ পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥ ৫

ব্রহ্মকে না জানিয়া, আমরা তাঁহাকে বুঝাইতে চাহি। ইহাই আমাদিগের দোষ। কেবল গুরুজনের ও ঋষিগণের উপদেশ অনুসরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা করাই, আমি নিরাপদ মনে করি।

যতই এই ব্রহ্মবিদ্যার কথা ভাবি, ততই ইহার অতলস্পর্শ গভীরতা,—অশেষ শক্তি,—অফুরন্ত শোভা ও সৌরভের কথা চিন্তা করিয়া

(১) কঠোপনিষৎ।২।৫,৬।

(১) প্রশ্নোপনিষৎ।১।১৬।
(২) মেথিউ।১৫।১৪। ও লিউক্।৬।৩৯।
(৩) " ।২৩।২৩—৩৩।
(৪) মেথিউ।৩।৭—১২,৩৪, ২৩।৩৩।ও লিউক। ৩।৭।
(৫) মহাভারত। আদিপর্ব্ব।

আমি আত্মহারা হই। মনে হয়,—"এমন দিন কি হবে, যবে হরিনাম স্মরিয়ে প্রাণ যাবে ?"

এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াই, অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। কেনোপনিষৎ বলিয়াছেন,—

"তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবাণ্যান্ দেবান্ যদগ্নির্ব্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শু স্তেহ্যেনং প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।"(১)

অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রথমেই ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা অন্য দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন।

এই ব্রহ্ম-বিদ্যা বিষয়ে চিন্তা করিলে, আমাদের জীবনের অন্ধকার-রাশির মধ্যে, এক একটী করিয়া, আশার জ্যোতির্ম্ময়ী তারকা-রাজি ফুটিয়া উঠে,—আমাদের জীবনের পাপ-তাপ বিদূরিত হয়,—আমাদের জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক, সেই অনন্ত আনন্দসাগরের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে চির সমাধি লাভ করে,—আমাদের আগতপ্রায় বার্দ্ধক্য ব্রহ্মের চির-যৌবনে প্রবেশ করে। তখন আমরা অমৃত লাভ করি—অ-মর হই। তখন আমরা সংসারকে বলি,—"বিদায়। আমরা জ্যোতিতে আত্মহারা হইয়াছি।" ২

এই ব্রহ্মবিদ্যা পরমা শক্তি। গ্রীক্‌গণ বলিতেন,—"জ্ঞানেই শক্তি।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাষাতে বলা যায়—

"সেই 'বিদ্যা' যার মনে,তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিশাল।"

বেদান্ত বার বার বলিয়াছেন,—"ইহা জানিলে, মানব অমৃত লাভ করে,—অ-মর হয়—"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"১

অতএব—"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা
বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ। (২)

সেই আত্মাকেই জান। অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর। তিনিই অমৃতের সেতু।

আমাদিগের উপনিষৎ এই ব্রহ্মবিদ্যারই খনি। ইহাকে যতই গভীর ভাবে খনন করিবে, ততই অশেষ মণি-মাণিক্য নির্গত হইবে। কোন দেশে—কোন কালে, ব্রহ্মবিদ্যার এমন সুনির্ম্মল, পরিস্ফুট ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা হয় নাই। অন্য অন্য জাতি, নানা বিদ্যা ও বিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা, নানা ক্রমের সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের হিন্দুজাতি যেমন সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধান ও সাধন করিয়াছেন, এমন আর কোথাও নহে। গ্রীক্-দার্শনিক প্লেটো ও জর্ম্মাণ কাণ্ট প্রভৃতির মধ্যে যেন ইহার সমান্তরাল ভাবের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে, মানব আত্মা চিদাকাশে যতটা উড্ডীন হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অধ্যাত্ম বিষয়ে ভারতের স্থান জগতের শীর্ষদেশে। যতই ঐতিহাসিক পুরাবৃত্ত ও প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার হইতেছে, ততই এই কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে। আমাদের অতীত কাল গৌরবজনক। আমাদের বর্ত্তমান তেমন না হইলেও, ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ! যাঁহারা ইতিহাসের সাক্ষ্যতার বিষয় জানেন, তাঁহারা বিচলিত হইবেন না,—কারণ "ন কম্পতে জ্ঞঃ।" ৩

(১) কেনোপনিষৎ।২৭।

(২) Tennyson In Memoriam

(১) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।৩।১। ইত্যাদি।

(২) মুণ্ডকোপনিষৎ।২।২।৫।

(৩) প্রশ্ন।৫।৬।

এই ব্রহ্মবিদ্যার উৎস বেদান্তরূপ গাভী দোহন পূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণ ধন্য হইযাছেন,—শাক্যসিংহ, জরা মৃত্যু প্রভৃতিতে জর্জ্জরিত জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য, নির্ব্বাণামৃত স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। সকলেই জানেন, গীতামাহাত্ম্যে আছে,—

"সার্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং-
মহৎ।"৫।

আরও প্রাচীন গ্রন্থে, বেদ বেদান্ত দোহনেব কথা উল্লেখ আছে। সামবেদীয়া ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে,—

"ঋগ্‌বেদস্থং দুগ্ধে স্মৈ, বাগ্‌দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি।" ১

—"বাক্ সেই সাধকের নিমিত্ত ঋক্ প্রভৃতি বেদ স্থিত দুগ্ধ দোহন কবিয়া থাকেন। তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা হয়েন।"

ব্রহ্মবিদ্যাভিলাষী হইলে, সম্যক প্রকাবে এই বেদান্তকে দোহন করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন আমাদিগের আত্মা উত্তম রূপ পুষ্টিলাভ কবিবে না।

ব্রহ্মবিদ্যাই পবা বিদ্যা। "অথ পবা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" ২ যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা।

অপরা বিদ্যা কি? না, যাহা অক্ষব পুরুষকে জানাইতে সক্ষম হয় না। "তত্রাপবা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।" ২

তবে কি বেদ বেদাঙ্গ বৃথা? না, তাহা নহে। গাভীর স্তন ও স্তন্যে যে প্রভেদ,—বেদ বেদান্ত ও তন্মধ্যস্থিত ব্রহ্ম-বিদ্যাতেও সেই প্রভেদ। বাহিরের খোষা লইয়া যিনি থাকিবেন, তিনি বেদ বেদান্তকে অপরা বিদ্যারূপেই উপাসনা কবিবেন। উহাব মধ্যস্থিত গুপ্ত বিদ্যাই অক্ষব পুরুষেব সন্ধান দেয়। উহারই নাম ব্রহ্মবিদ্যা। উহা ভাষার আববণে জড়িত হইলেও, ভাবের বলে আববণ মধ্যস্থিত বিজকে ফুটাইতে হইবে। ক্ষুদ্র বীজকে প্রকাণ্ড বিটপীতে পবিণত কবিতে হইলে, যেমন, উহাকে বহু কাল ধরিষা, ধৈর্য্যের সহিত মৃত্তিকাব নীচে রাখিতে হয়, তেমনি, ঐ বেদ-বেদান্ত-নিহিত বীজকে, হৃদয়েব হীরণ্ময় জমিতে বোপণ পূর্ব্বক,বহুকালের সাধনা দ্বারা, প্রেম, ভক্তি, ও বিশ্বাসেব বসে পুষ্ট কবিলে, তবে কালক্রমে উহা ছায়াপ্রদ ও মোক্ষফলপ্রদ মহীরুহে পবিণত হয়। ব্রহ্মবিদ্যা-পাবদর্শী হইতে হইলে, "তবোবিব সহিষ্ণুঃ" ১ ও "তৃণাদপি সুনীচঃ" ১ হইয়া, রজেতে লুণ্ঠিত থাকিতে হয়, তাহা না হইলে বেদান্ত-বীজ অঙ্কুবিত হয় না।

পবা ও অপবা বিদ্যা বলিবাব তাৎপর্য্য এই যে, পুঁথিগত বিদ্যা সহজ, জ্ঞান ততটা সহজ নহে। সেই জন্য একটী ল্যাটীন প্রবচন আছে যে,—"Knowledge cometh, Wisdom lingereth."

সেই জন্যই, ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে যে, নাবদ সনৎকুমাবকে বলিয়াছিলেন,—

"সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ।"২

—"হে ভগবন্। আমি শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছি, আত্মবিৎ হই নাই।" নারদ বলিলেন,—"ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম বেদ, ইতিহাস ও পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধকল্প, গণিত, দৈব, নিধি, তর্ক, নীতি, নিরুক্ত, শিক্ষা

(১) ছান্দোগ্য।১।৩,৭।
(২) মুণ্ডক।১।১।৫।

(১) শ্রীচৈতন্য দেব।
(২) ছান্দোগ্য।৭।১।৩,৪।

কল্পাদি ব্রহ্মবিদ্যা, তন্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, নৃত্যগীতাদি সমস্তই শব্দ মাত্র। এই শব্দেই ব্রহ্ম আছেন জানিয়া ইহার উপাসনা করিবে।"

এই পরাবিদ্যার বিষয় চিন্তা করিয়া, মহাকবি মিল্‌টন্ গাহিয়াছেন,—

"আহা কিবা মনোহর দিব্য বিজ্ঞান!
নহে শুষ্ক কঠোর যথা মূর্খে বা করে জ্ঞান।
য়্যাপলো তান সম মধুর,
অমৃত-রসে সদা ভরপুর॥"

How sweet is Divine Philosophy?
Nor harsh and crabb'd as dull fools suppose,
But sweet as Apollo's lute.
A perpetual feast of nectared sweets
Comus 475-478

এই যে অপরা বিদ্যা দ্বারা অলভ্য, পরাবিদ্যা দ্বারা লভ্য ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা কি কেবল কবির কল্পনা মাত্র, অথবা কোন প্রাচীন বাগ্‌বাজারের খেয়াল? ছান্দোগ্যোপনিষদে সনৎকুমার নারদকে উপদেশ করিয়াছেন,—"যিনি ভূমা, তিনিই সুখ। অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ। ভূমাই জিজ্ঞাস্য,—জ্ঞাতব্য।" ১ এবং "যাঁহার দর্শনে, শ্রবণে, বিজ্ঞানে, আর অন্য দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, জ্ঞাতব্য থাকে না। তিনিই ভূমা।" ১

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

ব্রহ্মপুত্র।

শান্তি ঢালা আঁখি ভোলা
বিমল তরঙ্গে দোলা,
কি মাধুর্য্য হেরিলাম আজি দুনয়নে।
বিশাল বিস্তীর্ণ কায়,
প্রজ্বলিত প্রতিভায়,
উছলিত হাসি-রাশি প্রসন্ন আননে॥

দাঁড়াইলে এই স্থানে
দেবত্ব উপজে প্রাণে
অতি দূরে মন হ'তে ক্ষুদ্রতা পলায়।
সুখ সৌন্দর্য্যের সার
এমন দেখিনি আর
দুই তীরে তরুকুল আনন্দ ছড়ায়॥

সৈকতে নগেন্দ্র মালা
হরিত বরণে আলা
পাদধৌত-পরায়ণ ব্রহ্মপুত্র পানে,
আশীর্যুক্ত চক্ষু দিয়া,
রহিয়াছে নিরখিয়া,
এমন দেখিনে আর কভু দুনয়নে।

প্রতি তরঙ্গের কোলে,
হর্ষে কৃতজ্ঞতা দোলে,
সুধীরে স্রোতস্বী গায় করুণায় গান।
এই সঙ্গীতের মর্ম্ম
কেবল নিষ্কাম ধর্ম্ম
নিঃস্বার্থে অপরে করে আপনারে দান॥

হে দেব! হে শান্তিদায়ি!
মানুষ নহেক স্থায়ী
বিগ্রহে আবদ্ধ প্রাণ সতত চঞ্চল।

(১) ছান্দোগ্য ৭।২৩।১ ও ৭।২৪।১।

শরীর তেয়াগী যবে,
পরাণ বাহির হ'বে
সেই দিন ক'রো প্রাণে তরঙ্গ নির্ম্মল ;
নেচে নেচে দুলে দুলে,
আনন্দে উঠিয়া ফুলে,
শ্যামল বনের শোভা করিব দর্শন,
প্রশান্ত হৃদয়ে রব,
ধুমে ঘোর হ'বে তব,
এ প্রাণে আসিবে ছুটে সমুদ্র-স্বপন ॥

অমনি জাগিয়া উঠি,
স্বদলে চলিব ছুটি,
ছুটির হরষ বোলে, সাগরের পানে।
সাগরের সংযোজন,
অসীমতা বিলোকন,
দিনরাত অবিশ্রাম, জেগে রবে প্রাণে ॥

গাঢ় আলিঙ্গন যবে
সিন্ধুর সহিত হবে,
পুলকে পর্ব্বত কায় হইব তখন।
সীমা হতে সীমান্তরে
বেড়াব হরষ ভরে,
আকাশ ভাবিবে মোরে নির্ম্মল দর্পণ ॥

হীরকে খচিত হেম,
শশির সহিত প্রেম,
সেই প্রেমে ভ'রে যাবে পরাণ আমার ॥
পূর্ণকল সুধাকরে
ভালবাসা স্নেহ ভরে,
দান করে প্রাণ পাবে আনন্দ অপার ॥

চকোর মিটাতে ক্ষুধা
পিয়ে যে নির্ম্মল সুধা
এ প্রাণের ভালবাসা সে অমৃতে রবে।
নির্ম্মল নদীর কূলে
শিশিরে পবনে ফুলে
ঝরিবে আমার প্রাণ নিশীথে নীরবে ॥

করুণার নাহি শেষ
হে তরঙ্গি, দিব্য বেশ,
চির নূতনতা, তব অঙ্গের ভূষণ।
ইচ্ছা হয় তীরে তীরে
ভ্রমণ করিয়া ধীরে
শেষ করি মায়ামুগ্ধ মানব জীবন ॥

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

প্রতিবাদ।

শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার রায় মহাশয় জ্যেষ্ঠ মাসের "নব্যভারতে" "উভয় রামকৃষ্ণ তুলনা" প্রবন্ধে (পৃঃ ১০৭) লিখিয়াছেন যে, "পরমহংস রামকৃষ্ণ নিজ সাধন ভজন জন্য, উন্নত জীবন লাভের জন্য রাণী রাসমণি ও মথুর বাবুর নিকট কত ঋণী! .. . এই সকল কথা তাঁহার জীবনচরিতে অতীব ম্লান, অতি অস্পষ্ট ; যেন বিলুপ্ত প্রায় বলিয়া বোধ হয়"। ১০০ পৃষ্ঠাতে লিখিয়াছেন "এই অংশে তাঁহাদের" (পরমহংশ দেবের "কতিপয় শিষ্যের") "লেখা অপূর্ণ, অস্পষ্ট ও সহৃদয়তা-বিহীন"।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিসনের স্বামীজিগণ ইহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে করিবেন কিনা, জানি না। তবে তাঁহাদের অন্যতম, স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত "রামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ" পুস্তক পাঠ করিলে উক্তরূপ দোষারোপ করা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ উক্ত পুস্তকে রাণী রাসমণি ও ৺মথুরানাথ বিশ্বাসের যথেষ্ট

প্রশংসা করা হইয়াছে। ফলতঃ তাঁহারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা করায় সমগ্র জগৎ তাঁহাদের নিকট ঋণী। তাঁহারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে ঈশ্বরাবতার জানিয়াই কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে "পরমহংসদেব তাঁহাদের নিকট ঋণী!" এরূপ বলা অপ্রযোজ্য।

১০৭ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু লিখিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে "কোন কঠোর ভজন তপস্যা, ব্রতাদি করিতে দেখা যায় নাই ··"। ১১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে "তাঁহার জীবনে কোন কৃচ্ছ্রসাধনা ও বৈরাগ্য কঠোরতা লক্ষিত হয় না"। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যৌবনে অনেকরূপ কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। তাহার বিবরণ স্বামী সারদানন্দ-কৃত উক্ত পুস্তকে, শ্রী"ম" কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে এবং "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পুঁথিতে" বর্ণিত আছে। তবে তিনি যে সাধনাই আরম্ভ করিতেন, অচিরেই তাহাতে সাফল্য লাভ করিতেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন "অথচ যেন অকস্মাৎ বিকশিত জ্ঞান বা জাগ্রত বলিয়া প্রতীত হয়। এই জন্য অনেকে তাঁহাকে ভগবৎ-কৃপাসিদ্ধ বলেন।"

১১১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "পরমহংস রামকৃষ্ণ রাণী রাসমণির উদ্যানে সমৃদ্ধি-রসাল-শাখা-লম্বিত পোষা শুক পাখী, "স্বাধীন-বন-বিহঙ্গ" নহেন। ইহাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বিশেষত্ব। তাঁহাকে সাধারণ যোগীদিগের ন্যায় জঙ্গলে গিয়া সাধনা করিতে হয় নাই। পরন্তু রাণী রাসমণি-প্রমুখ ভক্তগণ আপনাদিগকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন।

১১১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে "পরমহংস রামকৃষ্ণের কোন সম্প্রদায়কে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে প্রভাবশীল দেখিতে পাওয়া যায় না।" একথা নিতান্ত অমূলক। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুর ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিসনের কার্য্য কিরূপ সুন্দর ভাবে চলিতেছে ও ক্রমশঃ কিরূপ বাড়িয়া যাইতেছে, এ সংবাদ রাখেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। স্বামীজিগণ তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রের বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন। সেগুলি পড়িলেই মিসনের কার্য্য-প্রসার বিষয়ে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যায় এবং বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-মিসন যথার্থই "সজীব, সতেজ ও বহু কার্য্য-সাধনক্ষম"।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বর্ষা-সঙ্গীত।

(১)

আষাঢ় এসেছ সখি,
উজল পবিত্র আলো!
ঢালো ও করুণাধারা
ঢালো—এইখানে ঢালো!
সমস্ত বরষ প্রিয়,
হয়ে আছি মৃত প্রায়,
তোর মত স্নেহময়ী
না দেখিনু কারে হায়!
শরৎ—সে বেশভূষা
সদা বড় ভালবাসে,
হেমন্ত—সে কি বলিব

থেকে থেকে বড় হাসে।
শীত—সে উল্লাসে ভরা
অভাগার তবে নয়।
বসন্ত—সে এত হাসে
প্রাণে তাহা নাহি সয়।
নিদাঘ—সে পোড়ে প্রাণ
শুধু 'জল জল' রবে,
বরষা, এসেছ সখি!
বেঁচে আছি তোরি তবে।
ব্যথীর ব্যথার বোঝা
কোন খানে নামাবার,
সারা বর্ষ মিলে নাই
এত টুকু স্থান তার।
আজি সে ব্যথার বোঝা
নামাইব তোরি কাছে,
তোরেই দেখাব খুলে
জ্বালা ব্যথা যত আছে।
কত ব্যথা জ্বালা দুখ
কত ক্লান্ত অশ্রুভার,
হৃদয়ে রয়েছে ঢাকা
নহে তা তো কহিবার।
ঢালো ওই স্নেহধারা
করুণার প্রস্রবণ,
মরতে স্বরগ ভেবে
মুদে থাকি দুনয়ন।
তোরে পেলে সারা বর্ষ
কিছু না চাহিব আর,
তোরি মাঝে ডুবাইব
বিষণ্ণ জীবন ভার,
বিশ্বের সম্পদ-সুখ
চাহিব না মোর তরে,
উষার তপন আলো
আমার আঁধার ঘরে।
চাঁদের মধুর ছটা
পাপিয়ার গীতিধার,
সঙ্গীতে বেহাগ বাণী
প্রীতি-সিক্ত মলয়ার।
কুসুমের হাসি রাশি
প্রকৃতির মধুরতা,
নির্ম্মল তটিনী মুখে
মৃদুল কল্লোল গাথা।
জগতের যত শোভা
চাহিব না ফিরে আর,
তুমি যার শান্তিময়ী
আনন্দ শান্তির ধার,
সে কিবা চাহিবে ফিরে
চাহিবার কিবা আছে,
তোমারি ও স্নেহরাশি
সারা হৃদয়ের মাঝে।
বল তুমি প্রিয়তম,
আজীবন অভাগার।
মৃত্যু ভুলে লভি আমি
অমৃত স্বর্গের দ্বার।

শ্রীবিভাবতী সেনগুপ্তা।

---

(২)

ম্লান নীলিমা, অনন্ত আকাশে,
নিবিড় জলদ পুঞ্জ।
প্রলয় শ্বাসে পবন বোষে,
ছিন্ন মালতী কুঞ্জ।
ঝরে স্বর্ণধারা শিরীষ শীর্ষে,
শ্যামল পলাস পর্ণে,
সুষমা-সম্ভারে ভাতে জলধর,
বিচিত্র সপ্তবর্ণে।
আজি, চারু চন্দ্রকে মদিরা বেশা,
নৃত্য-নিপুণা চিত্ত-হরষা,
নীল নয়নে বিজলী বরষা,
কেকারবে হর্ষ বিহ্বলে,

নাচে, মত্ত শিখিনী যুগলে!
রণরঙ্গিণী রুদ্রতটিনী,
প্রখর চল তরঙ্গ,
হরিত ক্ষেত্র পূর্ণ প্লাবনে,
কম্পিত বেতসী-অঙ্গ,
গিরি-কন্দরে ইরম্মদ নাদে,
কম্পে কবেণু করিণী।
শৈলশিখরে, বনবীথি কুঞ্জে,
ত্রাসে লুকায় হরিণী।
কোথা, চূর্ণকুন্তলা স্বপন-বিভলা,
পুষ্প পেলব পাণি,
মম লাজ-লুলিত আনত-আননা,
যৌবন-বন-চারিণী?
এই বিরহে বরষা-রাণী?
তার, লীলা-চঞ্চল নয়নে দামিনী-প্রভা,
মন্থর গতি জলধর,
মঞ্জুল মঞ্জীরে, মেঘমন্দ্র ধ্বনি,
সুখস্পর্শ সজ্জা সুন্দর।
বর্ণে ইন্দ্রধনু, মধুমন্থন,
মানসী মত্তকরিণী,
হৃদি-শিখরে, বন-বিহারিণী,
ঝঞ্ঝায় ভীতা হরিণী।
অভিমানে ক্রোধ-ইরম্মদ ছোটে,
শ্বাস প্রলয় পবন।
বিরহে নয়নে ঝরে বর্ষাধারা,
মিলনে শিখিনী নর্ত্তন।
প্রেম উপেক্ষায় ভীমা কল্লোলিনী,
প্রখরা কুলপ্লাবিনী,
সুখ-ক্ষেত্র প্লাবি প্রবল প্রবাহে,
স্ফীতা পদ্মা রূপিণী।
মম, প্রিয়া যে বরষা রাণী,
তনু, নিন্দিত নব নবনী,
মানসী চিত্ত-হারিণী।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২৫। নিবেদিতা। শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত, মূল্য ॥০। ভগ্নি নিবেদিতা বিধাতার এক অপূর্ব্ব রচনা, ইদানীন্তন কালে এরূপ নিষ্কাম ব্রতধারিণী সংযম-পূতা মহিলা বড় বেশী দেখা যায় না। শ্রীমতী সরলাবালা দাসী এই মহিলার সংক্ষিপ্ত জীবনী মধুর ভাষায় লিখিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্রী হইয়াছেন। পুস্তকের ভাষা সুন্দর। অনুরাগের সত্য-মণ্ডিত জীবন্ত আলেখ্য। এ পুস্তক ছেলেমেয়ে ভুলান অলীক গল্প বা ছবির বই নয়। পুস্তকখানি স্বদেশী এণ্টিক কাগজে ছাপা।

২৬। দেবদূত। শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ॥০। ইহা একখানি নাট্যকাব্য। দেবকুমারের লেখনী ধন্য যে, তিনি যাহা লেখেন, তাহাই মধুর হয়। স্থানে স্থানে লেখা এত মধুর হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে অবাক্ হইতে হয়।

হের—ওই গঙ্গা-বক্ষে স্থির-দীপ্তিমান
লক্ষ প্রদীপের সারি। যেন, জাহ্নবীর বক্ষোপরে
দুলিতেছে মণি-মালা লহরে লহরে;
অথবা যেনরে হ'লে ভকতের পূজা সমাপন,
আলোকিয়া শুচি-স্বচ্ছ জাহ্নবী-জীবন।
ভ্রমিয়া এ কাশীধামে, জলিয়া বেড়ায় দুলি' দুলি'
উচ্ছ্বসিত ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তিগুলি।

অরবিন্দের চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে, যেন সুধার খনি। স্বদেশী এণ্টিক কাগজে ছাপা।

২৭। মহরম। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত, মূল্য ।৶০। স্বদেশী এণ্টিক কাগজে ছাপা। কিন্তু মলাটে বিলাতী কাগজ! সুন্দর ভাষায় সংক্ষিপ্ত রূপে মহরমের যাবতীয় জ্ঞাতব্য কথা বিধিবদ্ধ। লেখকের লিপি-চাতুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম।

লোকশিক্ষা।

অনারেবল্ গোখলে সাহেবের সাধারণ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার পর হইতে, অনেকে এই বিষয়ে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রায় সকলেই পাণ্ডুলিপি সমর্থন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ লোকশিক্ষার অনুকূলে মত দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই বিষয়ে বঙ্গদর্শনে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং অসংযত ভাষায় পাল মহাশয়কে একটু আক্রমণও করিয়াছেন। যাহা হউক, পাল মহাশয় আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ; তাঁহার পক্ষে আমার অগ্রসর হওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমি কোনও বিতণ্ডায় জড়িত হইতে চাহি না। তবে লোকশিক্ষা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

জাতক ভূমিষ্ঠ হওয়া কালে যে পরিমাণ শিক্ষিত থাকে, তাহার জীবনে যদি তদপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভ না করিতে পারে, তবে তাহার অবস্থা কিরূপ হয়? এ প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে দুই মত হইতে পারে না। সুতরাং শিক্ষালাভ করিতেই হইবে, এ বিষয়েও মতদ্বৈধ নাই। সম্পূর্ণ নিরক্ষর ব্যক্তিও বয়োবৃদ্ধির সহিত উত্তরোত্তর অধিকতর শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু বর্ণমালার সাহায্যে স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া মঙ্গলজনক কি না? আর কিরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়াই বা মঙ্গলজনক? এই সকল কথা লইয়াই মতভেদ হইতে পারে। যদি মঙ্গলজনক হয়, তবে কিঞ্চিৎ "জবরদস্তি" করাও অসঙ্গত হয় না। এ নিমিত্ত জনসাধারণকে বর্ণমালার সাহায্যেই স্কুলে শিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা এবং কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাহাই আলোচনা করিব।

জাতক পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের বহু পুরুষের ধাতু লইয়া জন্মগ্রহণ করে। দেহ ও মন, উভয়ই সে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। ইহাই তাহার ব্যক্তিত্ব। পূর্ব্বপুরুষাগত উপাদান সকল তাহার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে ঐ সকল উপাদানের মধ্যে কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়ে; অবশিষ্টাংশ প্রচ্ছন্নই রহিয়া যায়। অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রচ্ছন্ন লক্ষণ বাহির হইতে পারে, প্রতিকূল অবস্থায় প্রকাশের বাধা জন্মিয়া থাকে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, শিক্ষা কি? শিক্ষাও পারিপার্শ্বিক অবস্থা মাত্রই, আর কিছুই নহে। সুতরাং বংশপরম্পরাগত উপাদানের মধ্যে যে সকল উপাদানের অনুকূল শিক্ষা প্রদত্ত হয়, সেই সকল উপাদানই প্রকাশ লাভ করিবার অবসর পায়, অন্যগুলি প্রচ্ছন্নই রহিয়া যায়। শিক্ষা দ্বারা জাতকের বংশানুক্রমিক দোষগুণ প্রকাশ করা যাইতে পারে, যাহা তাহার দেহে ও মনে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার কিয়দংশ বাহির করা যাইতে পারে, কিন্তু যাহা তাহার অভ্যন্তরে নাই, তাহা দেওয়া যাইতে পারে না। জাতক যে ব্যক্তিত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার অতিরিক্ত কোন উপাদান তাহার দেহে ও মনে শিক্ষক প্রবেশ করাইতে পারেন না। তিনি বংশানুক্রমকে বিকশিত করিতে

পারেন, কখনও বা পাবেনও না, কিন্তু জাতকে যাহা নাই, তাহা এক বিন্দুও তিনি বাহির হইতে প্রবেশ করাইয়া বংশানুক্রমের গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। অধ্যাপক টমসনের দৃঢ় ভাষা এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত।

"We have no experience of any means by which transmission may be made to deviate from its course, nor from the moment of fertilization can teaching, hygiene or exhortation pick out the particles of evil in that zygote, or put in one particle of good" †

গুরু প্রাজ্ঞ শিষ্যকেও যেমন, জড়-শিষ্যকেও তেমনই, বিদ্যা বিতরণ করিতে পারেন, কিন্তু ঐ বিদ্যা গ্রহণ করিবার শক্তি দিতে পারিবেন না। সুতরাং উভয়ের ফল তুল্য হয় না।* ঐ শিষ্যদ্বয়, (প্রাজ্ঞ ও জড়-শিষ্যদ্বয়) বরং বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা না করিলে সমভাবাপন্ন থাকিতে পারিত, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টাতে এই হইল যে বাল্যের বাহ্যিক সমতা যৌবনে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাণ্ড ভেদ উৎপন্ন করিল। বাল্যকালে উহারা যদিও বা এক সঙ্গে পান ভোজনে ক্রীড়া-কৌতুকাদি করিত, কিয়দংশে এক ভাবেই অনুপ্রাণিত ছিল, কিন্তু শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে গিয়া এ জীবনে আর সে ভাবের সাক্ষাৎ পাইবে না‡, উভয়ের ভেদ পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া পড়িবে।

† Heredity p 607 * উত্তরচরিত।

‡ The lower orders will be mightily astonished, when they really get education, to find that it is the fatalist of all discerners and enforcers of distinctions * * *Two children go to school, hand in hand and spell for half an hour over the some page. Through all their lives, never shall they spell from the same page again.—Ruskin, Time and Tide

শিক্ষালাভের চেষ্টা হইতে বড়ই ভেদ উৎপন্ন হয়। সকলেই জানেন, বাল্যকালে যাহাদিগের সহিত একগলা প্রেম ছিল, এখন আমাদিগের নামের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই চারিটী অক্ষর সংযুক্ত হইবার পর আর তাহাদিগের সহিত মন মিলে না। আমরা, অক্ষরওয়ালারাই কি কোন বিষয়ে এক-মত হইতে পারিতেছি! কত মারামারি, ঝগড়া বিবাদে ভেদকে আরও বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছি, তাহা বলাই যায় না। বরং অশিক্ষিত লোক মধ্যে ঐক্য-বন্ধন সহজে হয়, কিন্তু শিক্ষিত অল্পই হউক, অধিকই হউক, শিক্ষিতগণ মধ্যে ঐক্য বড়ই দুর্লভ পদার্থ। বিভিন্ন ব্যক্তির বংশগত উপাদানও বিভিন্ন প্রকার; সুতরাং শিক্ষা উহা হইতে বিভিন্ন উপকরণ প্রকটিত করায় লোক-চরিত্রও বিভিন্ন হইয়া পড়ে। বহুজনের একতা একজনের সাহসের মূল। এই একতার হ্রাস যাহাতে করে, ব্যক্তিগত সাহসের হ্রাসও তাহাতেই হইয়া থাকে। সুতরাং ঈদৃশ লোকশিক্ষায় সাহসেরও হানি হয়। শত মূর্খকে এক ডাকেই লাঠি সহ বাহির করা যায়, কিন্তু দশজন শিক্ষিতকেও তদ্রূপ করা যায় না। বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট স্কুল-শিক্ষার এই এক ফল, ইহাতে লোককে ইতস্ততঃ-পরায়ণ করিয়া তুলে, দ্বিধা, সন্দেহ, তর্ক এ সকল ক্রমেই বাড়াইয়া তুলে, সুতরাং সাধারণকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিলে চিরতরে বিপ্লব নিবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু সমাজ মধ্যে সাহসী ব্যক্তির অসদ্ভাব ক্রমেই বৃদ্ধি হইবে। ইংলণ্ড দেশে এখন আইন দ্বারা জনসাধারণকে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছে, অনেকেই তাহাতে অসম্মত হন। বর্ণমালার শিক্ষা ইতস্ততের ভাবকে বড়ই জাগাইয়া

তুলে। এ ফল মঙ্গলজনক কি না, তাহা আমাদিগের বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

যাঁহারা এই সকল মীমাংসা সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন না, তাঁহারাও বোধ হয় ইহা স্বীকার করিবেন যে, শিক্ষার ফলে অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতেই অধিক ক্ষেত্রে দেখা যায়। আমরা পূর্ব্বে যে অবস্থায় তৃপ্ত ছিলাম, এখন সে অবস্থায় তৃপ্ত থাকি না। জনসাধারণও নিরক্ষর অবস্থায় যেরূপ ভাবে তৃপ্ত আছে, বর্ণাক্ষর-মূলক স্কুলের শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তদ্রূপ থাকিবে না। এই প্রকারে আত্ম-তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটিলে সহজেই অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। অথচ বিপিনবাবুর একজন সমালোচক তাহাও ইচ্ছা করেন না *। এই শ্রেণীর সমালোচকগণ সাধারণ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবেন, "অথচ মানুষকে আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে উপদেশ" দিবেন। ইহা হইতে পারে না। যোগীগণের ন্যায় উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে আত্মতৃপ্ত থাকা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু লোকশিক্ষা কখনই ততদূর উঠিতে পারে না।

সাধারণকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যায় না, অন্ততঃ বর্ণমালার সাহায্যে স্কুলে তাহা দেওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। অধিকাংশ ব্যক্তিই উচ্চ শিক্ষা পাইবার চেষ্টা করিতে গেলে একুল ওকুল দুকুল হারাইবে। প্রকৃতপক্ষে হইতেছেও তাহাই; ইহারা সকল দেশেই ঝাড়ের গোবরের ন্যায় বৃথা হইয়া যাইতেছে। তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে যে, "ইহারা শিল্প অথবা ব্যবসা শিক্ষা করুক। তাহা হইলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইয়া দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে।" এইরূপে ধনবৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি। কিন্তু ধনই জীবনের প্রধান কথা নহে। ধন না হইলে চলে না, সত্য। কিন্তু অতিমাত্র ধন-বৃদ্ধি হইলেও, শিল্প বাণিজ্যের অত্যন্ত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও, কত জাতি অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে, তাহা অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া, স্পেন, পর্টুগাল, হলাণ্ড, আরব স্থান-বাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারে। তার পর, অতিমাত্র বাণিজ্য ক্রমে চরিত্রহীনতা, বিলাসিতা, ও বংশহানি উৎপন্ন করিয়া থাকে। ‡ সুতরাং বাণিজ্যাদির উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত যদিও লোকশিক্ষা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু তাহার ফল বিষময়, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। অতিশয় অর্থশালী হওয়া ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, জাতকের পক্ষেও তেমনই অমঙ্গলজনক।

ডারুইন-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, যে সমাজে চরিত্রবান কৃতী ব্যক্তির সংখ্যা অধিক, তাহার উন্নতিও অধিক হয়। স্কুলের শিক্ষা, যাহা জনসাধারণের জন্য ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা চরিত্র গঠনে অর্থাৎ সচ্চরিত্র ও সুনীতিপরায়ণ ব্যক্তি উৎপন্ন করিতে নিতান্তই অক্ষম। নীতিতত্ত্ববিৎ সুবিখ্যাত ডাক্তার লম্‌ব্রোসের মতে দুর্নীতির উপর বিদ্যাশিক্ষার প্রভাব অত্যন্ত কম। * তিনি বলেন, নিরক্ষর ও শিক্ষিতগণের সংখ্যার অনুপাতে নিরক্ষর-

* মহাভারত ১৩১৯। ৯৩ পৃঃ।

‡ Hustle, hustle is the cry of commerce and of commerce only. * * Hustle, hustle may allow a company to declare a 20 per cent dividend and to rush up shares, but it steadily works for sterility and other forms of degeneracy.
Race Culture, p 82.

* Contrary to general belief the influence of education on crime is very slight—Criminal Man, p 149.

গণ অপরাধী কম। যদিও তিনি শিক্ষা বহু বিস্তৃত হইলে এই দুরবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে বলিয়া আশা করেন, তথাপি দুষ্কার্য্যের প্রকার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ভিন্ন, সংখ্যা পরিবর্ত্তনের আশা রাখেন না। নরহত্যা কমিতে পারে, কিন্তু জাল জুয়াচুরি বাড়িবে। শিক্ষা সচ্চরিত্রতা আনয়ন করে না; ক্ষণকালের নিমিত্ত করিলেও স্থায়ী রূপে করে না। বংশানুক্রম সংশোধিত না হইলে জাতীয় চরিত্র সংশোধন হয় না, ইহাই এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে। পিয়ার্শন বলেন,

"There is no hope of racial purification in any environment which does not mean selection of the germ" (The Scope & p 39).

অর্থাৎ শুক্রশোণিত বিশুদ্ধ না হইলে চরিত্র বিশুদ্ধ হয় না।

"ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ"—ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। স্ব-ভাবই প্রবল হয়, যে বংশানুক্রমে দুরাত্মা, সে বেদ পাঠ করিলেও সচ্চরিত্র হয় না। সুতরাং বর্ণাক্ষর-যুক্ত শিক্ষার দ্বারা জনসাধারণকে চরিত্রবান করিবার আশা সুদূরপরাহত। ইহা আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি। শিক্ষিত বদমায়েসের বৃদ্ধি হইতে ডাক্তার বেণ্টুল দেখাইয়াছেন † যে, ইউরোপ এবং আমেরিকাতে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত কয়েদীর সংখ্যা এবং শিক্ষিত বিকৃতমনাগণের সংখ্যাও ক্রমেই বাড়িতেছে; ঐ বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অনেক বেশী। মানব তত্ত্বের বিধি-সম্মত বিবাহ কার্য্য কোন দেশেই অনুষ্ঠিত হয় না। তন্নিমিত্ত অসতের ও সতের সংমিশ্রণে সর্ব্বদেশেই অসতের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সতের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। অসৎগণ প্রকৃত পক্ষে পশুভাবাপন্ন, দেহে ও মনে, উভয়েই। অসৎগণের দেহযন্ত্র পীড়াগ্রস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, উহা সজ্জনোচিত বিবর্ত্তন লাভ করে নাই। এই সকল বিবেচনা করতঃ বেণ্টুল্ বলেন, দুর্ব্বল স্নায়ু-বিশিষ্ট বালক বালিকাগণকে বর্ণমালায় শিক্ষিত করিবার বিফল চেষ্টা ত্যাগ করতঃ সাধারণতঃ স্বাস্থ্য রক্ষার ও সামাজিক বিধি নিষেধগুলির স্থূল স্থূল নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হয়। বেণ্টুলের এই মত † বর্ণমালা শিক্ষার অপেক্ষা করে না। এতদ্দেশীয় নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীস্থ জনগণের ন্যায় দেহ-শুদ্ধ এবং সামাজিক সদ্ভাব পূর্ণ মানব কোথাও নাই। সাধারণ শিক্ষা বিস্তারে এই অবস্থা স্থির থাকে না। ওয়ালেস্ চিরজীবন জীবতত্ত্ব অনুশীলন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে (১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রকাশিত গ্রন্থে) মীমাংসা করিতেছেন, "In times that permitted so much that was bad, education often tended to increase rather than diminish the evil" * সুতরাং ইহা যুক্তিমূলে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে স্বীকার করা যায় যে, স্কুল-লভ্য শিক্ষা চরিত্র গঠন করিতে সক্ষম নহে। আমাদিগের দেশীয় নিরক্ষরগণ প্রকৃতই চরিত্রবান ছিল। তাহারা যে সকল উপায়ে পৃথিবীর নিরক্ষরগণের অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্ব্বজন-

† Race culture

† Race Culture p 51. "They may be taught to be clean and to recognize some of the moral and social laws."

* The world of life p 397.

বিদিত। সে ফল স্কুলে হয় না, সমাজ হইতে গড়িয়া উঠে।

এই কথাই অন্যভাবে বলিবার চেষ্টা করিব। জীব-জগতে দেখা যায় যে, যে সকল জীব সমাজবদ্ধ হইয়া সামাজিক গুণের অধিকারী হইয়াছে, সমবেদনা ও ত্যাগ শিক্ষা করিয়াছে, একত্র দলবদ্ধ হইতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারাই সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। একদিকে জীবন-সংগ্রাম, অপরদিকে ঐক্য ও পরস্পরের সাহায্য জীবকে উচ্চ পদবীতে উন্নীত করে। যোগ্যতমের জয়, ইহা কোন-না-কোন অর্থে সমস্ত জীবের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—মানবেও প্রযোজ্য। যে সকল মানব যুগ যুগান্তর উন্নত হইতে পারে নাই, উন্নত সমাজের অংশ হইয়াও নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই যোগ্যতম নহে। তাহারা উন্নত সামাজিক ধর্ম্মে অধিকারী নহে। তাহাদিগের দেহ, মন বংশানুক্রমেই উচ্চ পদবীর অযোগ্য। তথাপিও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাহাদিগের মধ্যেও সময় ও সুবিধা পাইলে অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তি বংশানুক্রমের নিয়ম বশতঃই উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিবার যোগ্য থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগকে উঠাইবার নিমিত্ত সাধারণ্যে অবাধ বর্ণাক্ষরমূলক শিক্ষা বিস্তার করিতে গেলে, সুফল-অপেক্ষা কুফলের আশঙ্কাই অধিক। মহাত্মা গ্যাল্টন দেখাইয়াছেন,*—অতি নিম্ন শ্রেণীর প্রায় আড়াই হাজার ব্যক্তি হইতে তিনটী উৎকৃষ্ট অপত্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উত্তম শ্রেণীর ৩৫ জন ব্যক্তি হইতেই উহার দ্বিগুণ উৎকৃষ্ট অপত্য উৎপন্ন হয়। এই শ্রেণীর চিন্তা অনুসরণ করতঃ তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আমরা সমাজমধ্যে চরিত্রবান্ ও কৃতী ব্যক্তির সদ্ভাব দেখিতে ইচ্ছা করিলে, উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে যথোপযুক্তভাবে নিয়মিত করিতে পারিলেই সহজে ফললাভ করিতে পারিব, অন্যথা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উচ্চ শ্রেণীর অর্থে,—উচ্চবংশ এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নিম্ন শ্রেণীকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিলে মোটের উপর সমাজ লাভবান হয় না। অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি বংশানুক্রমে অধঃপতিত, তাহাদিগের দেহ ও মন তদ্রূপই। সুতরাং শিক্ষা যখন বংশানুক্রমিক ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে মাত্র, তখন তাহাদিগের অযোগ্যতা এবং সমাজদ্রোহিতা উত্তরোত্তর আরও বিকশিত করিবে ভিন্ন সমাজকে সৎপথে চালিত করিতে পারিবে না।

আমরা দেখিলাম,—লোক-শিক্ষা আবশ্যক, কিন্তু স্কুলের শিক্ষা নহে। কতকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষা ও সমাজনীতির নিয়ম শিক্ষা দিতে পারিলেই নিম্নশ্রেণীদিগের পক্ষে যথেষ্ট হয়; শিক্ষা পারিপার্শ্বিক অবস্থা মাত্র; তাহাতে বংশানুগত দুরাচার সংশোধন করিতে পারে না। আমরা দেখিলাম, বর্ত্তমান প্রণালীর স্কুল-শিক্ষা একতা ও সুসাহস নষ্ট করিতে পারে, অথবা না পারিলেও আত্ম তৃপ্তির ব্যাঘাত জন্মায় ধ্রুবং বিপ্লব সিদ্ধ করিতে সক্ষম। আমরা দেখিলাম,—সাধারণ অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিলেও সাময়িক ধনবৃদ্ধি হওয়া ভিন্ন আর কিছু হয় না; বরং পরিণামে ঐ ধনবৃদ্ধি হেতুই জাতীয় অধঃপতন হইয়া থাকে। আমরা

* "Thirtyfive V-class parents suffice to produce 6 sons of the V-class, it takes 2500 R-class fathers to produce three of them * * If then we desire to increase the out-put of V-class offspring, by far the most profitable parents to work upon would be those of the V-class.—
Essays in Eugenics p 17, 18

দেখিলাম,—শিক্ষা সদ্ভাব ও সচ্চরিত্র গঠন করিতে নিতান্তই অক্ষম, বংশ সংশোধন না হইলে দুর্নীতি নিবৃত্ত হয় না। অবশেষে দেখা গেল যে, নিম্ন শ্রেণীকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিলে অত্যল্প অংশকে উন্নত করা অসম্ভব না হইলেও মোটের উপর সমাজে যোগ্যতার পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়। এবং সমাজ মোটের উপর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই গুরুতর বিষয় বিশদরূপে আলোচনা করিতে গেলে অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বিপিন বাবু যদি সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের বিরোধী হন, শুধু "জবরদস্তীর" বিস্তার নহে—নিম্নশ্রেণীতে বর্ণাক্ষরযুক্ত স্কুল-লভ্য শিক্ষা বিস্তৃতি মাত্রেরই বিরোধী হন, তবে তিনি বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রতিকূল ভাবাপন্ন নহেন। যে সকল বিখ্যাত মনীষিগণের মত উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে বিদ্বজ্জনাগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বিপিন বাবুর সমালোচকগণের বোধ হয় আপত্তি হইবে না। প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক যুগের ধারণা এক্ষণে আর সম্যক স্থির রাখা যাইতেছে না। শিক্ষিত বদ্‌মায়েসগণ সকল দেশেই ঐরূপ ধারণায় বিষম আঘাত দিতেছেন। বিপিন বাবু যদ্যপি বর্ত্তমান প্রণালীর লোক-শিক্ষা, বিশেষতঃ ইউরোপ ও আমেরিকার লোক-শিক্ষার ফল সকল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতঃ উহার গুণানুধ্যানে আত্মহারা হইতে না পারিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার দোষ দেওয়া যায় না। যাঁহারা ইউরোপীয় লোক শিক্ষার গুণ সকল চিন্তা করতঃ মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা জগৎপূজ্য মনীষিগণের মত অনুধাবন করিলে মোহের কুহক কিঞ্চিন্মাত্রও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। আমি বিতণ্ডা করিতে উপস্থিত হই নাই, কেবল বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক মতের একটু আভাস দিলাম মাত্র।

শ্রীশশধর রায়

ব্রহ্মবিদ্যা। * (২)

পুনঃ—

"ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি।" ১

বেদান্ত ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়া,মানবকে মিথ্যা কল্পনার দিকে চালিত করিতেছেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

তবে, আমার মনে হয়, যে আমরা ঠিক সেই পথে চলিতেছি না, যদ্দ্বারা, সেই আনন্দরূপের, অমৃতরূপের দর্শন লাভ হয়, "তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমৃতং যদ্বিভাতি।"২

আরও মনে হয়, যে আমরা আত্মজ্ঞানের পথে না চলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হই বলিয়াও অকৃতকার্য্য হই, কারণ,—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ।।" ৩

আরও একটী কথা মনে হয়, সেটী এই যে, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা আমরা ব্রহ্মবিদ্যা

* এই প্রবন্ধ "ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকায় অংশতঃ প্রকাশিত হইয়াছিল,—ব্রহ্মবাদীতে নহে।

(১) ছান্দোগ্য ।৭।২৬।২।

(২) মুণ্ডকোপনিষৎ ।২।২।৭।

(৩) ঐ ।২।২।৯।

সাধনা করি না বলিয়াই, উহা ফলবতী হয় না।

এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ অমূল্য নিধি বহু আয়াসে ও যত্নে লব্ধ হয়, কারণ গোলকণ্ডার হীরক খনি অপেক্ষাও উহা বহু গুণ মূল্যবান। শ্রীচৈতন্য দেবের সুমধুর ভাষাতে বলা যায়,—

"সেই 'বিদ্যা' যার মনে,তার 'মূল্য' সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিশাল।"

এই ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচরণনিঃসৃত পবিত্র জাহ্নবী ধারার ন্যায় কেবল জিতেন্দ্রিয়, মৃত্যুঞ্জয়, মদনভস্মকারী মহাদেবেরই জটা-জুটের মধ্যে অমৃত-কল্লোল উত্থিত করে। আমাদিগের মধ্যে যিনি সেই সৌভাগ্য লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। নচেৎ এ উচ্চ অধিকার মিলিবে না।

আমরা কি নারদ ও সত্যকাম প্রভৃতি সাধকের মত, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ আয়ত্ত করিতে কখনও সক্ষম হইব?

সত্য ও সংযমই এই ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায়। তদ্ভিন্ন আর অন্য রাজকীয় পথ নাই।

কঠোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি।" ১

মুণ্ডক উপনিষৎ বলিতেছেন,—

"সত্যেন সত্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।
সম্যক জ্ঞানে নিত্যব্রহ্মচর্য্যেন নিত্যম্॥" ২

কেনোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা
বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্॥" ৩

সর্ব্বত্রই সেই একই কথা।

আমরা ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃত উপায় সমূহ বিস্মৃত হইয়া, ব্রহ্মবিদ্যার অনুসরণ করিয়া থাকি বলিয়া, বীরভূম-গৌরব চণ্ডীদাসের প্রেম সম্বন্ধীয় এই গীতটী আমাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে,—

"পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা!
বিষিখের কল, নহেত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা।
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে,
পিরীতি সাধিল যে,
পিরীতি রতন, লভিল সে জন,
বড় ভাগ্যবান সে।"

আর একজন বিদেশীয় প্রেমিক ও কবি, হাফেজ গাহিয়াছেন,—

"যাহার হৃদয়-দর্পণ বাসনার মলিনতা হইতে মুক্ত হয় নাই, তাহার চক্ষু তত্ত্বজ্ঞানের মুখাবলোকনের উপযুক্ত নহে।"

মস্‌নভি নামক গ্রন্থে মৌলানা জেলাল্ উদ্‌দীন রুমী গাহিয়াছেন,—"জান কি? দর্পণ কেন ছবি দেখায় না? কারণ, উহার মুখ হইতে মলিনতা দূর হয় নাই!"

এই কারণেই আমরা ব্রহ্মবিদ্যায় অগ্রসর হইতে পারি না।

হ্রদ-বক্ষ নির্ম্মল না হইলে, তাহাতে স্বর্গের শোভা পড়ে না।

বহুকাল ধরিয়া ভারতে ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে। আমরা চরিত্রহীন ভাবে, ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনা করি বলিয়াই, উহাকে বৃথা বলিতে পারি না। এই পুণ্য ভূমিতে, সহস্র সহস্র,লক্ষ লক্ষ,কোটী কোটী নরনারী জীবনের সমুদায় সুখ ও ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া, মানব চক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, এই ব্রহ্মবিদ্যা জানিবার জন্য, জীবন নিয়োগ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আর্য্যজাতির সাহিত্যে, কঙ্কাল

(১) কঠ।১।২।১৫।
(২) মুণ্ডক।৩।১।৫।
(৩) কেন।৩৩।

রূপে, সেই অতীত অধ্যাত্ম জীবনের ও সাধনের সাক্ষ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখন,কে এমন "সাবধান গুরু" আছেন, যিনি আমাদিগকে সেই অমৃতের প্রকৃত সন্ধান বলিয়া দিবেন? কে এমন ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসু আছেন, যিনি, তৃষিতা হরিণীর ন্যায়, সেই অশেষ-লতা-গুল্ম-পত্রাচ্ছাদিত অমৃত-উৎসের উদ্দেশে উদ্‌গ্রীব হইয়া, এই সংসার-অরণ্যে ধাবিত হইবেন?

শাক্যসিংহের ন্যায়, কে এমন বীর সাধক আছেন, যিনি ব্রহ্মবিদ্যাকে সাধন করিয়া, ভাবতের মৃত কঙ্কালের মধ্যে,আবার নবজীবনের তাড়িত প্রবাহ ছুটাইয়া দিবেন? ভ্রাতঃ! কেবল হরিবোল ও ব্রহ্মগোল করিলে চলিবে না,—গৌতমের মত,—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন", বলিয়া, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক, প্রাণপণে, ব্রহ্মবিদ্যার সাধন করিতে হইবে। ভীষ্ম ও লক্ষ্মণের মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও ব্রহ্মচর্য্য চাই। সংসারের তব্‌লার চাটী মারিয়া, সে ব্রহ্মবিদ্যা "ফাও" স্বরূপ উপার্জ্জন করা যায় না, যাহা তোমার, আমার বা কোটী কোটী নরনারীর পক্ষে মোক্ষদা হইবে।

সকল বিদ্যার ন্যায়, সকল বিজ্ঞানের ন্যায়, ব্রহ্মবিদ্যা দুই প্রকার,গণিত ও ফলিত,—একটী মতগত, অপরটী কার্য্যগত,—Theory এবং Practice যাহাকে বলে।

শাক্যসিংহের বিষয় কথিত আছে যে,—"তিনি যাহা কহিতেন, তাহাই করিতেন।" ১ তাঁহার মত ও কার্য্য এক ছিল।

ব্রহ্মবিদ্যাকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা রূপে, অন্বয়, ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী, ন্যায়, দর্শন, কথকতা, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের দ্বারা ব্যাখ্যা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। ইহাকে হৃদয়ের অন্বয় দ্বারা, জীবনের ভাষ্যে পরিণত করিতে হইবে,—ইহাকে, কেবল শুভ্র-তুষার-কিরীট-পরিহিত ধবলগিরির অগম্য ও দুর্লভ সৌন্দর্য্য-রাশির ন্যায়, কল্পনা-নেত্রে, সুদূরস্থিত বিষয় রূপে ভাবনা করিলে, দেখিলে বা জানিলেই চলিবে না। ইহাকে সেই চিদাকাশের সবিতার কৃপা-দৃষ্টির গুণে বিগলিত-তুষার-রাশির প্রবাহ-নিঃসৃত দ্রবময়ী গঙ্গার ধারার ন্যায়, এই গ্রীষ্ম প্রধান-দেশের উপত্যকা-ভূমির অশেষ শোভা, সৌন্দর্য্য, শস্য-শ্যামলতা, সজলতা ও সফলতার কারণ করিতে হইবে, এবং মর্ম্মের, পাপে তাপে, দুঃখে ও দারিদ্র্যে বিচলিত-চিত্ত জীবের দৈনিক দুর্গতি নিবারণের ও চির-মোক্ষবিধানের উপায় করিতে হইবে,—তবেই আমাদিগের ব্রহ্মবিদ্যা সফলা হইবে,—আমাদিগের জীবন ব্রহ্মবিদ্যা লাভে, সার্থক, ধন্য ও সুখশান্তিময় হইবে। নচেৎ, আমাদিগের ব্রহ্মবিদ্যা,"ভেক কোলাহল"মাত্র,কেবল আমাদিগের সর্ব্বনাশকারী মোহ এবং অহঙ্কারকে আরও বর্দ্ধিত করিবে এবং মুক্তিলাভকে দুরূহ করিবে।

কে এমন বজ্রপ্রতিজ্ঞ সাধক আছেন, যিনি এই জীবনের দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালা অতিক্রম পূর্ব্বক, হিমালয়ের ধবল-গিরির শিরোভূষণ স্বরূপ, অধ্যাত্ম জগতের সর্ব্বোচ্চ শিখরস্থিত হিমানীরাশির ন্যায়, ব্রহ্মবিদ্যায় উপনীত হইবেন? কেবল উপনীত হইবেন, তাহা নহে, উপনীত হইয়া, ব্রহ্মকৃপা-স্রোতের সহস্রার-বিগলিত মুক্তিধারায় আমাদিগকে নিত্য সিক্ত করিয়া, এই দেহে থাকিতে থাকিতেই, স্বর্গ সুখের অধিকারী করিবেন? ভগীরথের ন্যায়, আমাদিগের মধ্যে একজনও, সেই ব্রহ্মবিদ্যা,—মন্দাকিনীকে, স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিতে পারিলে, আমাদিগের সকলেরই মুক্তির পথ খুলিয়া যাইবে, ও হত-

(১) বংশমুক্ত।৫।১৫।

ভাগিনী ভাবতী মাতার চির দুঃখ দূর হইবে এবং পৃথিবীর সুখ ও শান্তি বর্দ্ধিত হইবে।

আমরা গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় বিদ্যা জাহির ও ঝিলি-মিলি-পানিয়ায় সুরে গীত গাহিয়া ও রচনা করিয়া, যদি কখনও মনে করি যে, ব্রহ্মবিদ্যা আমাদিগের আয়ত্ত হইয়াছে, তবে আমরা নিতান্তই ভ্রান্ত। কঠ ও মুণ্ডকোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥" ১

"বেদাধ্যাপন, মেধা ও বহু শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না। ইনি যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন,—তাঁহারই নিকট তিনি নিজ তনু ব্যক্ত করেন।"

মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন,—"তোমাদিগকে দ্বিজ হইতে হইবে। কৃপা-পবন নিজ ইচ্ছা মতই প্রবাহিত হয়। তোমরা তাহার শব্দই শুনিতে পাও, কোথা হইতে আইসে, কোথায় যায়, জানিতে পার না। এই প্রকারেই আত্মা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়।" ২

মহর্ষি মহম্মদ্ শ্রীমৎ কোরাণে, "সুরা মেহেরবানে" বলিয়াছেন,—"দয়ালু তাঁহার দাসকে কোরাণ শিক্ষা দিয়াছেন।" তিনি "সুরা বক্‌রাতে" বলিয়াছেন,—"ভগবানের চালনাই ঠিক চালনা।" এবং "ব্রহ্মের দীক্ষা আমরা লাভ করিয়াছি এবং তাঁহার ন্যায় কে দীক্ষা দিতে পারে?" তৎ পর সুরাতেই বলিয়াছেন,—"তিনিই তাঁহাকে শাস্ত্র, জ্ঞান, বিধি এবং তত্ত্বকথা শিক্ষা দিবেন।"

(১) কঠ ১।২।২৩। ও মুণ্ডক। ৩।২।৩।

(২) John. 3 7, 8.

প্রেমিক হাফেজ গাহিয়াছেন,—"বন্ধু! হৃদয়-সভাতে তোমার মুখের প্রকাশ শত দীপ জ্বালিয়া দিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তোমার মুখের উপর শতবিধ আবরণ রহিয়াছে।"

একটী রুবায়েৎ বলিতেছেন,—

"ন বজাবী, ন বজাবো, ন বজর্
মিলা এদ্ খোদ্ বখুদ্ আঁবুতে
আইয়াব ববাব মিযা এদ্॥"

"ক্রন্দনের দ্বারা,—বলের দ্বারা,—বা ধনের দ্বারা তাঁহাকে আনয়ন করা যায় না। সখা স্ব-ইচ্ছাতেই আমার কক্ষের নীচে আগমন করেন।"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে আছে,—

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরের কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥১

এবং

"পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে।"১

দেহেতে ছাই ভস্ম মাখিয়া ও উপবাস করিয়া, বা চন্দন-চর্চ্চিত দেহে, ক্ষীর-সর-নবনী খাইয়াই, যদি মনে করি যে, আমরা ব্রহ্ম-বিদ্যাকে উদরস্থ করিয়াছি,তবে আমরা নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন। মস্তক-মুণ্ডন, বা লোম-বর্দ্ধন দ্বারা, ব্রহ্মকে জুল্‌ফের ফাঁদে নিজস্ব করিয়া ধরা যায় না। আমাদিগের নানা প্রকার ভ্রম হইতে পারে বলিয়াই, মুণ্ডকোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥"২

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ম।৬।

(২) মুণ্ডক। ৩।২।৪।

"যাঁহার বীর্য্য নাই, সেই (ব্রহ্মচর্য্যহীন) ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। বিষয় মোহ ও তজ্জনিত ঔদাসীন্য বা খাম্‌খেয়ালী সন্ন্যাস-রহিত সাধন বা জ্ঞান দ্বারাও এই ব্রহ্মধাম লাভ হয় না।

সংসারের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া,—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, বা সুরা ও ব্যভিচারের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া, যদি মনে করি যে, একই শব্দে ব্রহ্ম ও সংসার উভয় রূপ লক্ষ্যকেই ভেদ করিয়াছি, তবে আমাদিগের ন্যায় অন্ধ আর কে আছে? কঠোপনিষদে যম বলিতেছেন,—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।"১

"দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত,—অশান্ত,—অসমাহিত বা অশান্ত-মানস ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারাও ইঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন না।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে যে,—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।"

বিত্তমোহে মূঢ় লোকগণের কথা স্মরণ করিয়াই মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন, এক কালে সংসার ও ভগবান উভয়ের সেবা হয় না।২

ব্রহ্মই "সংসার মোক্ষ স্থিতি-বন্ধহেতুঃ।"৩ তিনিই আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দ্বারা যুক্ত করুন। "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।৪"

এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত জীবের আর গতি নাই। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি। নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"৫ তাঁহাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। তাহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

না, না, সংসারের জন্য, ব্রহ্মবিদ্যাকে বা ব্রহ্মবিদ্যার জন্য সংসারকে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। এই সংসার তাঁহারই জানিয়া, ইহার সেবা করিতে হইবে। পুনঃ সংসার করণান্তর বাণপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক, ব্রহ্মবিদ্যা উপার্জ্জন ও প্রচারে জীবন নিয়োগ করিতে হইবে। ইহাই হিন্দুর ধর্ম্ম ও প্রণালী।

এই ব্রহ্মবিদ্যাতে সিদ্ধ হইতে হইলে, ইহাকে ফলিত বিজ্ঞানে পরিণত করিতে হইলে, একনিষ্ঠ হইতে হইবে। কোন বিদ্যাতে পারদর্শী হইতে হইলে, আজীবন দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক, তাহাতে মগ্ন থাকিতে হয়। একদিন তরলায় চাটী মারিয়া, তে, রে, খি, টা, করিলেই বাদক হওয়া যায় না।

একান্ত ভাবে, বিষয় বিশেষের সাধনা করিয়া, আর্কমিডিস্, নিউটন্, পাস্কাল্, এডিসন্, বসু, রায় প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদগণ জগতে সত্য আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও রাজর্ষি জনক, দাউদ্ ও রোমান্ সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস্ প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যার অনুসন্ধান করিয়াছেন। তবে, এ প্রকার ব্রহ্মবিদ্যাতে নিষ্ঠা সংসারে অতি বিরল।

ফলিত বিজ্ঞানের বলে, দুর্ব্বল মানব প্রকৃতির মহাশক্তি-রূপ করিসমূহকে যথেচ্ছ অঙ্কুশাঘাৎ পূর্ব্বক নিজ নিজ অভীষ্ট পথে গমন করিয়াছেন, এবং সুনীল নভের গর্ভ হইতে, তাড়িৎকে বিতাড়িত করিয়া, নিজের আহারীয় প্রস্তুত করাইয়া লইতেছেন,—তদ্দ্বারা বার্ত্তা ও বাক্য প্রেরণ করিতেছেন, এমন কি বিনামা পর্য্যন্ত ঘর্ষণ করাইয়া লইতেছেন। জড়-বিজ্ঞানের বলে, আধুনিক মানব, নদ নদীর স্রোতের মধ্যে তরঙ্গায়িত ব্যর্থ শক্তিকে আজ সার্থক করিয়া, কতই কল-কারখানা চালাইয়া লইতেছেন, এবং বারিরাশির মধ্যে

(১) কঠ ।১।২।২৪।
(২) Matthew 6 24
(৩) শ্বেত ।৬।১৩।
(৪) ঐ ।৪।২২।
(৫) ঐ ।৬।১৫।

প্রচ্ছন্ন বিজলীকে আমাদের পথে ঘাটে দীপমালার বেশে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন!

আমরা যদি জড়-বিজ্ঞানের উপাসনার মত, অকৈতব ভক্তি সহকারে, ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে যত্নবান থাকিতাম, তবে এই ক্ষুদ্র জীবনের ব্যর্থ শক্তির মধ্যেই, অনন্ত অমৃত-সাগরের সুদূরশ্রুত তরঙ্গ-নির্ঘোষ শ্রবণ-গোচর করিতাম এবং সর্ব্বজীব-হিতকারী কল্যাণস্রোত প্রবাহিত করাইবার জন্য প্রয়োজনীয় চিৎশক্তির,—ব্রহ্ম শক্তির উৎস, নিজ নিজ আত্মার ভিতর দিয়া, নিজ নিজ সমাজের মধ্যে ছুটাইতে পারিতাম।

মূলাধারে সুষুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিতে না পারিলে, সহস্রার বিগলিত ব্রহ্ম-বিদ্যার ধারা প্রবাহিত হইবে না,—পুণ্যতোয়া জাহ্নবী-বিধৌত, আধ্যাত্মিক-সম্ভাবনা-পরিপূর্ণ ভারতভূমিকে, ব্রহ্মবিদ্যার বলে, পুনরায় "সোণার" জমিতে পরিণত করিতে হইলে, "কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, তোমায় আমায় মাকে দেখিতে," হইবে।

রাজনৈতিক অশান্তি ও হলাহলের মধ্যে, বা সমাজ-সংস্কাররূপ কোলাহলের মধ্যে, একনিষ্ঠ ভাবে সে "কৃষিকাজ" হইবে না।

কবি ও সাধক রামপ্রসাদ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

"মন তুমি কৃষিকাজ জান না।
এমন সোণার জমি, রইল পতিত, আবাদ কর্লে, ফল্‌তো সোণা।"

সেই কারণেই, শাক্যসিংহ, সক্রেটীস্, ঈশা প্রভৃতি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ রাজ-নৈতিক পণ্ডগোল হইতে দূরে থাকিতেন।

অপ্রমত্ত হইয়া, অর্জ্জুনের ন্যায় একনিষ্ঠ ভাবে, এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে হইবে।

মুণ্ডক-উপনিষৎ বলিতেছেন,—

"প্রাণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥"১

শর যেমন শীকারের দেহে প্রবেশ করে, তেমনি, অপ্রমত্ত চিত্তে, প্রণব ধনুর যোগে, আত্মারূপ শরকে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যে, প্রবিষ্ট করাইতে হইবে।

আমরা তাহা পারিব কি? যদি না পারি, তবে, আমাদের ব্রহ্মবিদ্যা, কেবল, পুঁথিগত বিদ্যা,—কেবল বকতালি বা উপাধি-লাভের উপায়,—কেবল মোহ ও অহঙ্কার বর্দ্ধিত করিবার পথ। বেকনের ভাষায় বলিতে গেলে, "অলঙ্কার ও অহঙ্কার বর্দ্ধনের জন্য,—"For ornament and conceit." ২ কার্লাইল আমাদের ব্রহ্মবিদ্যা শুনিয়া হয়তো বলিবেন, "হৃদয় শূন্য ও শুষ্ক, মস্তিষ্ক অকর্ম্মণ্য কোলাহলে পূর্ণ,"—"The head full of worthless noise, the heart empty and dead."৩ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ, ইহাকে "ভেক কোলাহল" বলিয়াছেন, এবং বৃথা বিদ্যাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন,—

"অরসিক রায়স চোষে নিম্ব ফলে।
রসিক কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥৪"

কত দিনে যে আমরা ব্রহ্মবিদ্যার রসিক হইব, তাহা জানি না!

এই পুণ্যভূমির ধর্ম্মবৃক্ষে যে অপূর্ব্ব নির্ব্বাণ ও বেদান্ত-রূপ অমৃত ফল ফলিয়াছিল, তাহা অমৃত-রসে পরিপূর্ণ।

মহর্ষি ঈশাকে এক যুবা পুরুষ অমৃতের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।৫ কিন্তু

(১) মুণ্ডক।২।২।৪।
(২) Bacon's Essays
(৩) Carlyle Heroes and Hero-Worship
(৪) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। মধ্যখণ্ড। ৮ম পরিচ্ছেদ।
(৫) Matthew 19 16

ইহার বহু পূর্ব্বে, শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদে, যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে ও মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে এই প্রশ্নের উত্তম উত্তর প্রত্যুত্তর রহিয়াছে।১ এমন স্বামী ও এমন স্ত্রী এই ভারতবর্ষেই সম্ভবে। নব্য ভারত ইহা সম্যক বুঝিবেন কি?

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি।"১ এবং,—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং। যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।"১ যদ্দ্বারা অমৃত লাভ হয় না, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

এই অপূর্ব্ব দাম্পত্য কথোপকথনের মধ্যেই, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন,—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।২"

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ইহা লাভ হইলে, সকল জ্ঞানই লব্ধ হইল।

এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে, অপর লাভকে লাভই বলিয়া বোধ হয় না। "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"৩

ভক্তিসুধোদয় গ্রন্থে ধ্রুব-বাক্য আছে,—

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং
প্রাপ্তবান দেব মুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্ সমবাপরত্নং স্বামিন্
কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"

হে মুনীন্দ্রগুহ্য! স্থানাভিলাষী হইয়া, তপস্যা করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমাকে পাইয়া, কাঁচ খুঁজিতে খুঁজিতে, রত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আর অন্য বর চাহি না।

কেবল এই ব্রহ্মবিদ্যাই পূর্ণরূপে আত্মার ক্ষুৎ পিপাসা দূর করিতে পারে।

ইহা হিন্দুর যুগ যুগান্তরের সাধনার মধ্য দিয়া, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। অ-হিন্দু বা যাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত,—কোন্ ন্যায়, বিচার ও সততার দ্বারা, বেদ, বেদান্ত, বা তদীয় ব্রহ্মবিদ্যাতে ন্যায্য রূপে, দাবী করিতে পারেন? হিন্দু-শোণিত যাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত আছে, তিনি কৌপীনবন্ত হইয়াও, এই ব্রহ্মবিদ্যার গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত করিতে পারেন, কারণ, প্রকৃতির অন্তরতম স্থল ভেদ করিয়া, যেমন, স্রোতস্বতী স্যন্দিত, তেমনিই, এই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা, হিন্দুগণের যুগ যুগান্তরের সাধনার ভিতর দিয়া,—সৃষ্টির আদি হইতে, তাহার অস্থি-মজ্জা-শোণিতের মধ্য দিয়া আগত,—সহস্র বর্ষ-ব্যাপী ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও, হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনে, অতি সঙ্গোপনে রক্ষিত সামগ্রী। যিনি হিন্দু নহেন, তিনি কোন্ আইন্ অনুসারে, অন্যের পিতৃ-মাতৃ-ধন লুণ্ঠন করেন এবং অন্যায় রূপে, ভোগ, দখল, ও নিজস্ব বলিয়া জগতে প্রচার করিতে চাহেন?

যিনি হিন্দু হইয়াও নিজেকে অ-হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে শ্লাঘা মনে করেন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিদ্যাতে তাঁহার দাবী করাই উচিত নহে। পরন্তু, ইহাতে আর সকলেরই অধিকার আছে, কেবল পিতৃদ্রোহীরই পিতৃ-ধনে দাবী নাই। নচেৎ, ব্রহ্মে ও ব্রহ্ম-বিদ্যাতে, জীব জন্তু সকলেরই অধিকার। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সকলেই ন্যায্য রূপে, ইহাকে স্বীকার, ভোগ ও দখল করিতে পারেন।

(১) বৃহদারণ্যক। ২।৪।২, ৩। ও ৪।৫।৩—৬।
(২) ঐ ।৪।৫।৬।
(৩) গীতা।৬।২২।

ব্রহ্ম যেমন অনন্ত, ব্রহ্মবিদ্যাও তেমনি অনন্ত। নিউটনের জীবনীতে আছে যে, জ্ঞানের অসীমতা বুঝিতে পারিয়া, তিনি বলিয়াছেন,—"অনন্ত সমুদ্র তীরে, আমি উপল খণ্ড কুড়াইতেছি মাত্র।"

মহাত্মা অগষ্টাইন্ সম্বন্ধে কথিত আছে যে, একদা সমুদ্র-তীরে, ব্রহ্ম-তত্ত্বের মীমাংসা ভাবিতে ভাবিতে, ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে, দেখিলেন যে, একটী অতি প্রিয়দর্শন শিশু, সমুদ্র-জল লইয়া ক্রীড়া করিতেছে এবং একটী বালুকার ক্ষুদ্র আবর্ত্ত-মধ্যে, অঞ্জলী অঞ্জলী লবণাম্বু সেচন করিতেছে। অগষ্টাইন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি খেলা খেলিতেছ?" ঈষৎ হাসি হাসিয়া, দেব-শিশু বলিলেন,—"তোমারই মত, এই অনন্ত সমুদ্রকে আমার এই ক্ষুদ্র গর্ত্তে ভরিতেছিলাম।" ইহা বলিয়া শিশু-রূপী দেবতা অন্তর্দ্ধান হইলেন। আমরাও কি ঠিক্ এই রূপ, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির মধ্যে অনন্তকে ভরিতে চাই না?

তাই, কেনোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"যস্যমতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতাং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।"

যিনি ভাবেন জানেন না, তিনিই জানেন। যিনি ভাবেন জানি, তিনি জানেন না।

যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলে, জীব পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া, অনন্ত ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, সে বিদ্যার কথা আমি আর কি বলিব? "যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি।" কেন উপনিষৎ। ৩৪।

যে বিদ্যা লাভ করিলে, হৃদয়-গ্রন্থি সমূহ ভিন্ন হয়,—সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়,—এবং কর্ম্ম-সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সে বিদ্যা ও সে দর্শনের কথা বলিয়া আর ফুরান যায় না।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"
মুণ্ডক। ২।২।৮।

আসুন! সব ছাড়িয়া আমরা সেই বিদ্যাকেই জানি। "তমেবৈকং জানথ। অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ। অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।" মুণ্ডক। ২।২।৫।

এবং "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি।" শ্বেত। ৩।১০।

জানিলে, অমৃত লাভ। না জানিলে, দুঃখ।

এই যে মোক্ষদায়িনী ব্রহ্মবিদ্যা, সমুদায় জীবনেও ইহার সাধন ও গুণকীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারিব বলিয়া মনে করি না। একটী প্রবন্ধে তাহার কথা আর কতই বলিব?

মহর্ষি মহম্মদ বলিয়াছেন,—"অনন্ত আকাশ যদি পত্র হয়,—অনন্ত সিন্ধু যদি মসিরাশি হয়, —অনন্ত স্বর্গবাসিগণ যদি লেখক হয়েন, এবং অনন্ত কাল ধরিয়া যদি লেখনী চালনা করা যায়, তথাপিও সেই অনন্তের কণা মাত্র গুণ-কীর্ত্তন করা হয় না।" অনন্ত আকাশ ও অনন্ত কালের, অনন্ত অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া, যে ব্রহ্ম অনন্ত লীলায় মগ্ন, তাঁহার বিদ্যার সীমা আমি কোথায় পাইব? "অন্ত কোথা তাঁর? অন্ত কোথা তাঁর?" বলিয়া মানব-আত্মা, চাতকের মত পিপাসিত হইয়া, চিদাকাশে ক্লান্তপক্ষে বিচরণ করিতেছে, এবং চিরদিনই শ্রুতি বলিতেছেন,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ২।৪।১ ও ২।৯।১। এবং ব্রহ্মোপনিষৎ। ৩।

বাক্য মন তাঁহা হইতে ফিরিয়া আইসে, সে খানে চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকারাজি কিরণ প্রদান করে না,—সে খানে বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় না,—অগ্নি তথায় নাই,—তাঁহার প্রকাশে সমুদায়ই দীপ্যমান,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র

তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

কঠ ২।২।১।১৫। ও মুণ্ডক।২।২।১০।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদিগের কবিত্বপূর্ণ বাক্যজাল, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের প্রচুর অজ্ঞতা-প্রসূত মাত্র।

সেই অব্যক্ত রহস্য সম্যক্ প্রকারে ব্যক্ত করিতে যাইয়া, আমার বাণী ও লেখনী পরাস্ত। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

মহাত্মা গঙ্গাহরি নাড়া গোস্বামী।

(রাজসাহী বৈষ্ণব সমিতির অধিবেশনে পঠিত)

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥"

আজ এই সভাতে আমি এক ভক্তের জয় ঘোষণা করিতে উপস্থিত হইয়াছি। ইহাতে আমার দুই কার্য্যই সাধিত হইবে, ভক্তের জয় ত ঘোষণা করা হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের জয়ও ঘোষিত হইবে। ভগবানের জয়ে কেবল ভগবানেরই জয় ঘোষণা হয়, কিন্তু ভক্তের জয়ে ভগবান ও ভক্ত উভয়েরই জয় কীর্ত্তন করতঃ কৃতার্থ ও ধন্য হওয়া যায়। কারণ ভগবানেরই শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইয়াছে "মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা।"

এ পৃথিবীতে সাধু মহাত্মারাই মানব সমাজের আদর্শ। মানব জীবনে যদি কিছু গৌরব, যদি কিছু পুরুষার্থ থাকে, তবে তাহা সাধু মহাপুরুষদিগের দ্বারাই পরিস্ফুট ও দেদীপ্যমান হইয়া থাকে। বহু সহস্র গণ্যমান্য জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে, এমন কি, একাধিক পরাক্রম ও বিভবশালী নরপতি ও সৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন রণনিপুণ সমরবিজয়ী বীরকে, তুলাদণ্ডের একদিকে রাখিয়া, অপর দিকে একটী মাত্র সাধু ভক্তকে স্থাপিত করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, সাধু ভক্তের দিকেই তুলা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মহাপুরুষের এই যে গুরুত্ব—প্রভাব, ইহা কেবল তাঁহার জড়শরীরের রক্ত মাংস ও অস্থির সমবায়ের হেতু নহে, পরন্তু তাঁহার ভক্তির—ক্ষমা দান তিতিক্ষা, প্রেমের প্রভাব। সাধু-ভক্তের একটী মাত্র ফুৎকারে পৃথিবীতে কত অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, সাধু হৃদয়ের অনাবিল প্রেম এবং তাঁহার দীনতায় কত রাজা, কত রাজ্য, কত লোক, কত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বশীভূত এবং নবভাবে গঠিত হইয়াছে, ইতিহাসের পত্রোদ্ঘাটন করিলেই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তাই আমি সর্ব্ব প্রথমেই সভ্যগণের নিকট নিবেদন করিতেছি, আজ যে মহাত্মার নাম এই সভাতে কীর্ত্তন করিব, তাহার বিবরণে যদি কিছু অলৌকিক বা কিছু অপ্রাকৃত থাকে, তাহা অবিশ্বাসের ফুৎকারে উড়াইয়া না দিয়া, একটু স্থির ধীর চিত্তে আলোচনা করিবেন। মনে রাখিবেন, ভক্তের নিকট ভগবানের অদেয় কিছুই নাই এবং ভক্তের ক্ষমতাবলে জন্মান্ধ চক্ষু পায়, পঙ্গু মৈনাক লঙ্ঘন করে, সলিলে শিলা ভাসে, মৃততরু মুঞ্জরিত হইয়া থাকে।

ইংরাজি শিক্ষায় এবং বিজাতীয় সংস্রবে

আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে সত্য, —সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা এবং স্বাধীন চিন্তাশক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র সকল কার্য্যে প্রকৃত পন্থায় ঘটে না। আমরা যেন একটু বেশী বুদ্ধিমান—একটু অতিরিক্ত স্বাধীন বুদ্ধি-সম্পন্নরূপে প্রতীয়মান হইতে প্রয়াস পাইয়া থাকি। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, আমাদের সেই চিন্তা-শক্তি, বোধ-শক্তি এবং সত্যানুসন্ধানের প্রয়াস, অনর্থক অবিশ্বাস, হতাশ্বাস এবং কু-তর্কবাশিতে বিড়ম্বিত এবং সংপেষিত হইতেছে। এই বোঝা মন হইতে সরাইতে না পারিলে, কু-তর্ককৈতব-জাল ছিন্ন করিতে না পারিলে, আমাদের হৃদয়ে কখনও সহজ সরল বিশ্বাসের বেগাঘাত হইবে না, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের স্রোতে আমাদিগকে চিরকাল ভাসিয়া বেড়াইতে হইবে।

যখন আমাদের হৃদয় ও মন সরল ও বিশ্বাসী হইবে, তখন আমরা ভক্তকে দেখিয়া, সাধুকে দর্শন করিয়া, ভগবান কি পদার্থ, তাহা কতকটা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব। লোক-গুরু ধর্ম্মাচার্য্য সাধুমহাপুরুষেরা ভগবানের বিশেষ চিন্তা এবং তৎ কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে প্রেরিত হইয়াই এ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের এই দেবদত্ত ক্ষমতা ও প্রতিভার সঙ্গে, এ জড়জগতের ধন মান, বিদ্যা বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, কিছুরই তুলনা হইতে পারে না। তাঁহারা এ জগতে অতুলনীয়, তাঁহাদের তুলনা কেবল তাঁহারাই। মোহান্ধ মায়াবদ্ধ জীব সকল বৃথা পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্মাভিমানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই, হরিভক্ত মহাত্মার মহিমা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিবে এবং বিশ্বাস ও ভক্তিবলে পরম পুরুষার্থলাভে সক্ষম হইবে।

এখন আমি আলোচ্য বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

বঙ্গ দেশের স্বাধীন হিন্দু নরপতি আদি-শূর স্বরাজ্যের ব্রাহ্মণগকে বৈদিক জ্ঞানশূন্য দেখিয়া, কাণ্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া স্বীয় আরব্ধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহা-দের পাঁচজন কায়স্থ ভৃত্যও বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, তদ্দেশবাসী স্বজাতীয় ব্রাহ্মণবর্গ তাহাদিগকে লইয়া একত্রে আহার বিহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহারা স্ত্রী পুত্র লইয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া আই-সেন এবং রাজানুগ্রহে বসবাস করিতে থাকেন। কাল সহকারে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ বৃদ্ধি হওয়ায়, বৈদ্য কুলতিলক মহারাজ বল্লাল সেন তাঁহাদিগকে আপন রাজ্যের পাঁচ স্থানে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই ভাবে বারেন্দ্র, রাঢ়ী, বঙ্গজ, মৈথিলি এবং ওড়িয়া, এই পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়। যাঁহারা পদ্মা ও গঙ্গা নদীর মধ্য দেশে অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজিতে Delta বলে, সেই প্রদেশে বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে বঙ্গজ ব্রাহ্মণ বলিত। এই শ্রেণী পরিশেষে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র, এই দুই শ্রেণীর অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কালে বঙ্গজ শ্রেণীর কোন ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু কায়স্থদের মধ্যে ঐরূপ শ্রেণীর অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

কান্যকুব্জাগত উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে সাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ ওঝা নামে বেদ-পারগ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র, আদিগাঁই। এই বংশে পরবর্ত্তী সাধু বাগচী নামধেয় এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাহের-

পুরাধিপতি রাজা কংস নারায়ণ কর্ত্তৃক আহূত, তাঁহার একীকরণ সম্বন্ধীয় সভাতে সাধু বাগচী নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও 'কাপ' (অর্থাৎ জ্ঞান) করিয়া শয়ন করিয়া থাকায়, তাহার কাপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার দুই ভ্রাতা রুদ্র বাগচী এবং গোকনাথ লাহিড়ী কুলীনই থাকিয়া যান। এই সাধু বাগচীর বংশে অতঃপর লক্ষ্মণ নামে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন মহা ধার্ম্মিক ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই লক্ষ্মণই নাটোরের সন্নিকটস্থ আমহাটী গ্রামের গোস্বামী বংশের পূর্ব্ব পুরুষ। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ লক্ষ্মণ গোস্বামী অপরাহ্ন জীবনে সস্ত্রীক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নানাদেশ ও তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আমহাটী গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। লক্ষ্মণ সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কথিত আছে, তিনি বিপুল সম্পত্তির মায়া পরিহার করতঃ সন্ন্যাস আশ্রমে সামান্য পর্ণকুটীরে অবস্থান করিতেন। এই মহাত্মার একমাত্র পুত্রই আমাদের আলোচ্য মহাত্মা গঙ্গা হরি নাড়া গোস্বামী। আমাদের স্থানীয় মোক্তার, লক্ষ্মণ গোস্বামীর বংশীয়, বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরক্ত ভক্তিমান শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বহুদিন হইতে এই নাড়া গোস্বামী সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিতে আমাকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন, আমিও তাঁহার অনুরোধ পালন করিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম। কিন্তু নানা কারণ বশতঃ তাহা পালন করিতে বহু বিলম্ব ঘটিয়া গেল। তজ্জন্য আজ এই প্রকাশ্য সভায় পূর্ণ বাবুর নিকট আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য গললগ্নী কৃতবাসে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। সাধু মহাত্মার ক্ষমাই ভূষণ স্বরূপ; সুতরাং আশা করিতে পারি, আমি ক্ষমার নিতান্ত অনুপযুক্ত নহি।

প্রাগুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়, নাড়া গোস্বামী সম্বন্ধে কিছু বিবরণও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশই খাদারি গ্রাম নিবাসী কুলজ্ঞ শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র বিশারদ প্রভৃতির কুলপঞ্জিকা পুঁথি সমূহ হইতে সঙ্কলিত। তৎপর প্রাচীন নানা প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থ অন্বেষণ পূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই আজ আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতেছি।

মহাত্মা গঙ্গাহরির জন্ম বৃত্তান্ত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। একদা লক্ষ্মণ-পত্নী সন্ন্যাসিনী দেবী অতিশয় দুঃখিতান্তকরণে স্বামীর নিকট অপুত্রতা নিবন্ধন পুন্নাম নরকগামী হইবার আশঙ্কা প্রকাশ করায়, সন্ন্যাসী সহাস্য বদনে তাঁহাকে অভয় দান করেন এবং তদীয় মনোবাসনা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে অচিরেই একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হইবে, আশ্বাস দেন। ইহার অল্পদিন পরেই সন্ন্যাসিনীর গর্ভে তেজঃসম্পন্ন সুলক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রই গঙ্গাহরি নাড়া। তাঁহার নাড়া উপাধি হইবার কারণ, কেহ কেহ বলেন, সামান্য নাড়া-নির্ম্মিত পর্ণকুটীরে ভূমিষ্ট হন বলিয়া তাঁহার তদ্রূপ নামকরণ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আর একটী অভিমত আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিব। অনুমান ১৩৮২ শক হইতে ১৪০১ শকের (১৪৬০-১৪৭৯ খৃষ্টাব্দ) মধ্যে মহাত্মা গঙ্গাহরি অবতীর্ণ হন।

পুত্র প্রসবের পর পত্নী দিন দিন সংসার-মায়ায় জড়িত হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া, লক্ষ্মণ গোস্বামী অল্পদিন মধ্যেই একটী মৃণ্ময় পাত্রে পুত্রটীকে আবদ্ধ করিয়া নিকটবর্ত্তী

চন্দ্রাবতীর (মতান্তরে ছাইভাঙ্গা বিলের) জলে ভাসাইয়া দেন। পুত্রের অদর্শনে মাতা নিতান্ত শোকাতুরা হইয়া নিরন্তর রোদন করিতে আরম্ভ করেন। কিছুতেই পত্নীকে সান্ত্বনা করিতে না পারিয়া লক্ষ্মণ সপ্তাহ পরে বলিলেন,—"দেবি, শঙ্কা ত্যাগ কর; তোমার পুত্র জীবিত আছে। দেবী মঙ্গলচণ্ডী তাহাকে এই সপ্তাহ কাল সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। যখন তুমি কিছুতেই পুত্রহারা হইয়া থাকিতে পারিবে না, তখন একবার নদীর ঘাটে গমন কর। দেখিতে পাইবে, মৃণ্ময় পাত্রমধ্যে তোমার পুত্র অক্ষত দেহে দেবী মঙ্গলচণ্ডীর ক্রোড়ে বিরাজমান আছে। তুমি হাঁড়ি শুদ্ধ দেবীকে লইয়া আসিয়া, আমার ৺শালগ্রাম শিলা ও স্ফটিক লিঙ্গ শিব যে গৃহে প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং ভক্তিভরে তাঁহার সেবা পূজায় নিযুক্ত থাক। ইহাঁকে তোমার কুলরক্ষিণী দেবী-স্বরূপা জ্ঞান করিবে। আর যখন গঙ্গাকে হরণ করিয়া তোমার সন্তান আসিয়াছে, তখন আজ হইতে তাহার নাম 'গঙ্গাহরি' হইল। এই গঙ্গাহরি হইতে কালে তোমার বংশ সমুজ্জ্বল হইবে, জানিবা।" সন্ন্যাসিনী স্বামীর বাক্যানুসারে তাহাদের লালন পালন ও সেবা পূজায় মনোনিবেশ করেন। উক্ত মঙ্গলচণ্ডী এবং শালগ্রাম শিলা ও শিবলিঙ্গ অদ্যাবধি আমহাটীর গোস্বামীগণের গৃহে পূজিত হইতেছেন। উক্ত গোস্বামী বংশের অনেকে, জন্মাষ্টমী তিথিতে তাঁহাদের পূজিত ৺শ্যামরায় বিগ্রহের সম্মুখে অতিরিক্ত ধূমধাম হইবার রীতি দেখিয়া মনে করিলেন যে, মহাত্মা গঙ্গাহরি ঐ সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাই বৎসরের মধ্যে ঐ একটী উৎসবে মাত্র এরূপ অতিরিক্ত ধূমধামের প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা কোন লিখিত গ্রন্থে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই।

গঙ্গাহরি পিতার পর্ণকুটীরে থাকিয়া স্নেহময়ী মাতার স্নেহ-বাৎসল্যে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে তিনি অশেষ শাস্ত্রদর্শী পিতার নিকট ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য এবং শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। একাদশবর্ষে তাঁহার উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, গঙ্গাহরি পিতার নিকট বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। ইহাতে তাঁহার ধারণা জন্মে, বেদমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়াছেন; অপর তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণের আর কোন আবশ্যক নাই। এই ধারণার বশেই তিনি অপর কোন গুরুর শরণাপন্ন হন না। অবশেষে মধ্যাহ্ন জীবনে প্রেমাবতার গৌরহরি তাহার এই ভ্রম ঘুচাইয়া দিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ভক্তির উৎস প্রবহমান করান।

পাঠাভ্যাস শেষ হইলে মহাত্মা গঙ্গাহরি তীর্থ পর্য্যটনে বাহির্গত হন এবং নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করতঃ শ্রীবৃন্দাবন ধামে উপনীত হন। কথিত আছে, তথায় ভগবান গৌরহরি শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বৃন্দাবনের এক সম্ভপর্ণ বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর শাস্ত্রালাপ হয়। গঙ্গাহরি নাড়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্নিধানে ধর্ম্মশাস্ত্রের সার সার প্রশ্ন এবং তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কি, জিজ্ঞাসু হন। তদুত্তরে মহাপ্রভু গঙ্গাহরির সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ধর্ম্মশাস্ত্রের সারকথা এবং বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডাদির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। কিন্তু ইহাতেও নাড়ার মনের ধাঁধা মিটিল না, তিনি বলিলেন যে,

—বেদবিধিমতে যখন তাঁহার উপনয়ন (বৈদিক দীক্ষা) হইয়াছে এবং বেদশাস্ত্র তাহার আয়ত্ত হইয়াছে, তখন আর দশ সংস্কারের আবশ্যকতা কি? সন্ন্যাস আশ্রমে থাকিয়া বৈকুণ্ঠ-বিহারী হরির পদারবিন্দ চিন্তা করিলে ক্ষতি কি? এই প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর—হিন্দু সমাজে থাকিলে হিন্দুর পক্ষে বিবাহ আদি দশবিধ সংস্কার হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তন্ত্রমতে দীক্ষিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য্য ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। তৎপর গঙ্গাহরির মন বুঝিয়া এবং তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। কথিত আছে, এতদনুসারে গঙ্গাহরি শ্রীবৃন্দাবন ধামে অবস্থান কালেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন। অতঃপর ভক্তি ও প্রেম প্রভাবে গঙ্গাহরি নাড়া ৬৪ মহান্ত মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণব সমাজের চিরপূজ্য হইয়া উঠেন। দীক্ষা গ্রহণান্তর গঙ্গাহরি বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ হরিনাম প্রচার ও কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গঙ্গাহরি শাস্ত্রবিধান মতে সৎকুলোদ্ভবা এক কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যার নাম হরিপ্রিয়া দেবী। শুনিতে পাওয়া যায়, গঙ্গাহরি স্বীয় অলৌকিক বিদ্যাবুদ্ধি ও তপঃ প্রভাবে বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ নামে চতুষ্পার্শ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার সদাচার, তাঁহার অহৈতুক প্রেম ও দীনতায় মুগ্ধ হইয়া স্বগ্রামের বৈদ্যবংশ-সম্ভূত ভূম্যধিকারী হইতে নানাদেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি বহুতর ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করে। এই সময় দেশ বিদেশে তিনি মহা তপঃ-সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন। পিতার প্রতিষ্ঠিত ৺নারায়ণ শিলা, স্ফটিক শিব লিঙ্গ এবং মঙ্গলচণ্ডী ব্যতীত তিনি অতিরিক্ত এক সুঠাম দারুমূর্ত্তি শ্যামরায় এবং শ্রীমতী রাধিকার যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও তাহার সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই নির্জ্জনে জপ তপ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। শ্রেষ্ঠ জল-আচরণীয় হিন্দু ভিন্ন তিনি কোন নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তিকে মন্ত্র দেন নাই।

গঙ্গাহরির বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী বিলের (বা নদীর) অপর পারে হলুদ ঘর নামক তৎকালে এক প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকীর বাস করিতেন। ইঁহাদের উভয়ের বড়ই হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। কথিত আছে, গঙ্গাহরি প্রায়শই খরম পায়ে দিয়া এই বিল উত্তীর্ণ হইয়া ফকীরের আস্তানায় গমনাগমন করিতেন।* তদ্দেশবাসী জনগণ

* শ্রীল প্রভু নিত্যানন্দ-পুত্র গৌর-অবতার বীরচন্দ্র প্রভু সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। একদা তিনি পারিষদগণসহ নৌকা যোগে গঙ্গাস্নান মানসে শান্তিপুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে নৌকার উচ্চ হরিনাম কীর্ত্তন হইতেছে। এদিকে শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী তৎবিষয় অবগত হইয়া পুত্রকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত চন্দ্রশেখর পণ্ডিত ও মীনকেতন রামদাস প্রভৃতিকে আজ্ঞা করেন। তাঁহারা নদীতীর দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া নৌকার নিকটবর্ত্তী হন এবং স্থল-হইতে শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর আজ্ঞার বিষয় জ্ঞাপন করিতে থাকেন। কিন্তু উচ্চ হরি নামের রোলে সে বাক্য বায়ু হিল্লোলে উড়িয়া যাইতে লাগিল। কিছুতেই নৌকাস্থিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারিয়া —

ক্রোধ করি রামদাস (১) বার্ত্তা (?) কহিল,
নির্ভরে বাজিল নৌকা দুইখান হইল॥
শাপ দিয়া পরে প্রভু গঙ্গার মধ্য জলে।

গঙ্গাহরির এইরূপ নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য সন্দর্শনে তাঁহার পদানত হইয়াছিল এবং মহাপুরুষ জ্ঞানে তাঁহাকে অকৃতিম ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিত।

অতঃপর এক ঐতিহাসিক-ঘটনা বিবৃত করিতেছি। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোভাবের পর তৎপুত্র বীরভদ্র প্রভু নানা শিষ্য সমভিব্যাহারে অশ্ব দোলা প্রভৃতি যানারোহণে সমারোহ সহকারে শিষ্য বিস্তার ব্যপদেশে দেশবিদেশে গমনাগমন করিতেন এবং হরিনামের সুমধুর তানে দেশবাসীকে মাতাইয়া উন্মাদ প্রায় করিতেন। একদা এইরূপ হরিনাম প্রচার করিতে করিতে তিনি ঢাকা নগরীতে উপনীত হন। ঢাকা তৎকালে মুসলমান নবাবের রাজধানী ছিল। দেশের লোক সকল পাগলের ন্যায় বীরচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া কীর্ত্তন মহোৎসবে দিন যামিনী একভাবে অতিবাহিত করিতে লাগিল।

"গ্রামে গ্রামে মহোৎসব কীর্ত্তন প্রচার।
দেখিতে সকল লোক হয় চমৎকার॥
হরিনাম সংকীর্ত্তনে দেশ ধন্য হইল।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ নাম প্রকাশিল॥
হরিনাম মহামন্ত্র জীবে দান করি।
আপনে গাইয়া গাওয়াইল জগভরি॥
সবেই বৈষ্ণব হইল লয় কৃষ্ণ নাম।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলে নিত্যানন্দ রাম॥"

বীরচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে এইরূপ লোক-হট্ট এবং কোলাহল হইতে দেখিয়া নবাব কর্ম্মচারীবৃন্দ ইহাকে ভাবী বিদ্রোহের পূর্ব্বাভাষ এবং এইভাবে কিছুদিন ঘটিতে থাকিলে হিন্দুরা রাজ্য উলটাইয়া দিবে—ইত্যাদি কথা নানালঙ্কারে নবাবকে বুঝাইয়া দিল। নবাব তদ্দণ্ডে বীরচন্দ্র প্রভুকে কারারুদ্ধ করিতে এবং তাঁহার জাতি নাশ করিতে আদেশ দিলেন। নবাবের আদেশে তৎক্ষণাৎ প্রভু ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু জাতিনাশ সম্বন্ধে তিনি নবাবকে অনুরোধ করিলেন যে,—তাঁহার পিতৃশিষ্য নাড়া গঙ্গাহরি যতদিন না তথায় উপস্থিত হইয়া অলৌকিক ক্ষমতা বলে নবাবকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিবেন, ততদিন তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়াই যেন রাখা হয়, জাতি-ধ্বংস-কার্য্য স্থগিদ থাকে। নবাব প্রভু-বাক্যে সম্মত হইয়া গঙ্গাহরিকে হাজির হইবার জন্য ঘোষণা প্রচার করিলেন। যথা সময় গঙ্গা হরির প্রভু পুত্রের এই বিপদ পাতের বিষয় জ্ঞাত হইয়া, পাঁচজন শিষ্যসহ ঢাকা উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

নবাব-প্রাসাদের সিংহদ্বারে সশিষ্য ব্যাঘ্র-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক উপনীত হইয়া মহাত্মা গঙ্গাহরি হুঙ্কার ছাড়িলেন। তৎ শ্রবণে প্রহরীগণ সকলেই ক্ষণকালের নিমিত্ত অচৈতন্য হইয়া পড়িল। পরে এই সংবাদ নবাবের কর্ণে উঠিলে তিনি স্বয়ং পাত্র মিত্রসহ সিংহদ্বারে গমন করিয়া মহাত্মার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বতন্ত্র এক আবাস বাটী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের নিমিত্ত সময় নির্ণয় করিয়া দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে গঙ্গাহরি শিষ্যসহ নবাব দরবারে উপনীত হইলেন। দরবার গৃহের

কাষ্ঠ পাদুকা পায়ে জলের উপর চলে॥
অর্দ্ধ গঙ্গা গিয়ে পুন ফিরিলেন কূলে।
সন্তরণ করি তীর পাইল হিল্লোলে॥"
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বংশমালা, তৃতীয় স্তবক।

(১) বাঁধা (যথা-নন্দের বাঁধা)। গুরুভার বিশিষ্ট খড়ম বিশেষ। লেখক।

একপার্শে এক গভীর কূপ খনন করতঃ তদুপরি সামান্য আশ্রয় দিয়া গঙ্গা হরির নিমিত্ত আসন স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাত্মার যোগবলের কি অসীম ক্ষমতা। তিনি অবলীলাক্রমে ঐ আসনে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। নবাব মোহিত হইলেন সত্য, কিন্তু পাষণ্ড পারিষদবর্গের মন্ত্রণা ক্রমে বলিলেন যে,—এই পরীক্ষাই যথেষ্ট নহে। আরো কিছু দেখাইতে হইবে? তদুত্তরে কি করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক পারিষদ বলিলেন, "পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে এক পাত্রে গোমাংস ঢাকা আছে এবং তৎপার্শ্বে বীরচন্দ্র আবদ্ধ রহিয়াছেন, তুমি ক্ষমতা বলে মাংসপাত্র অন্তর্হিত এবং তোমার প্রভু-পুত্রকে সভাস্থলে আনয়ন কর।" মহাত্মা গঙ্গাহরি "তথাস্তু" বলিয়া সেই শূন্যোপরি স্থাপিত আসনে বসিয়া জপ আরম্ভ করিলেন। প্রথমবার জপ শেষ হইলে তিনি বলিলেন যে,—দেখুন গো মাংসের বং কিরূপ? নবাবের ইঙ্গিত ক্রমে এক ভৃত্য কক্ষদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক মাংস-ভাণ্ড সভাস্থলে আনিয়া সকলকে দেখাইল,—মাংসের বং পিঙ্গল বর্ণ এবং বীর চন্দ্রের মূর্ত্তি ঠিক যেন পিঙ্গলবর্ণের একটী ছবি। তৎপর আবার মাংসভাণ্ড যথাস্থানে রক্ষিত হইল, গঙ্গাহরি পুনরায় জপে মনোনিবেশ করিলেন। দ্বিতীয় বার জপের শেষে সকলে দেখিল—মাংসের বর্ণ তাম্রবর্ণ এবং বীরচন্দ্র যেন একটী তাম্রমূর্ত্তি পুত্তলিকা। তার পর তৃতীয় বার জপ আরম্ভ হইল। তদ্ অবসানে দেখা গেল, মাংসের বর্ণ গলিত স্বর্ণের ন্যায় এবং বীরচন্দ্র যেন একটী স্বর্ণ-পুত্তলিকা। অবশেষে চতুর্থবার জপ শেষ হইলে সকলে দেখিতে পাইল—বীরচন্দ্র প্রভু সশরীরে সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন এবং মাংস পাত্র শূন্য পতিত রহিয়াছে। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু নবাবের ভয়ে প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

অতঃপর নবাব বলিলেন—এই তৃতীয় পরীক্ষায় আপনি উত্তীর্ণ হইতে পারিলে স্বীয় অভীষ্টানুরূপ প্রার্থনা পূর্ণ করিব।—আচ্ছা, নবাব-প্রাসাদ এই মুহূর্ত্তে জলে ভাসাইয়া দিন দেখি?

নবাবের বাক্য শ্রবণ করতঃ গঙ্গাহরি-শিষ্যবর্গকে বলিলেন,—"বাপ সকল, একবার প্রস্রাব কর তো দেখি?"

গুরুর আদেশে শিষ্যগণ হুঙ্কার ছাড়িয়া প্রস্রাব করিতে আরম্ভ করিলেন। এ প্রস্রাব আর সামান্য প্রস্রাব নহে,—কিছুতেই তাহার আর নিবৃত্তি হয় না। দেখিতে দেখিতে নবাবের প্রাঙ্গণ, বারেন্দা, গৃহ সকল জলে ডুবিয়া উঠিল। আত্মীয় স্বজন সহ নবাব জলে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তখন নিরুপায় হইয়া নবাব করযোড়ে গঙ্গাহরির নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।—"প্রভু ক্ষান্ত হন, ক্ষান্ত হন! যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়াছে; আমার ভ্রম ঘুচিয়াছে। জল সরাইয়া দেন; আপনি যাহা চাহিবেন, আমি তাহাই দিব।"

গঙ্গাহরি তৎপরে শিষ্যগণকে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। অচিরাৎ জল শুকাইয়া গেল,—নবাবপুরী পূর্ব্ববৎ হইল। গঙ্গাহরি এই সময় যে হুঙ্কার ছাড়িয়াছিলেন, তাহাতেই নাকি হাজার নাড়ানাড়ির উৎপত্তি হয়।

কুলজ্ঞদিগের গ্রন্থে লিখিত পূর্ব্বোক্ত বিবরণের সহিত বৈষ্ণব সাধকদিগের লিখিত গ্রন্থের ঐক্যতা দেখা যায় না। শেষোক্ত

বিবরণে বীরচন্দ্র প্রভুর নবাব গৃহে আবদ্ধ থাকার কথা এবং গঙ্গাহরির প্রভাবে মুক্তি-লাভের কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। 'শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর বংশমালা' গ্রন্থের সপ্তম স্তবকে লিখিত আছে,—

বীরচন্দ্র প্রভু শিষ্যবর্গ সহ নাম প্রচার করিতে করিতে ঢাকা নগরীতে উপনীত হইয়া নাড়ার প্রধান নৃসিংহ দাস নামক শিষ্যকে নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহাকে নবাব সকাশে প্রকাশ করিতে আজ্ঞা করেন,—

* * * * *

"সেইদেশে অধিকারী হয় যবন।
তারে উদ্ধারিমু করি প্রভুর হৈল মন॥
নৃসিংহ দাসেরে কহে হও আগুয়ান।
খস্তি লইয়া যাহ তুমি রাজা বিদ্যমান॥
কহিবা আইলা গোসাঞী গৌড়দেশবাসী।
আসিবে তোমার স্থানে কীর্ত্তন প্রকাশি॥"

আজ্ঞানুসারে নৃসিংহ দাস নির্ভয়ে নবাবের নিকট যাইয়া গুরুর আদেশ প্রকাশ করিলেন এবং হস্তস্থিত নিশান প্রাঙ্গণের মধ্য স্থলে প্রোথিত করিলেন। নবাব অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া নিশান তুলিয়া ফেলিয়া নৃসিংহ দাসের হস্তস্থিত খস্তি কাড়িয়া লইতে ও তাড়াইয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। তদনুসারে—

আজ্ঞামাত্র চারিজন চারি খস্তি ধরে।
আত্মশক্তি যত দিয়া টানাটানি করে॥
ছাড়িয়া যাইতে নারে না পারে তুলিতে।
জড় প্রায় রহে কিছু না পারে বলিতে॥
অষ্টজন আসি তবে পুনহ ধরিল।
তাহারা তেমতি রহে মৃত প্রায় হৈল॥
বলিষ্ঠ যবন শত শতেক আনিয়া।
বহু দম্ভ করি তারা ধরিল আসিয়া॥
পরশিবা মাত্র সবার হস্ত রহে লাগি।
আর কত দুষ্টগণ দূরে চৈতে ভাগি॥

একদিকে তো এই,—অন্যদিকে আর এক মহান্ বিপদের অঙ্কুর দেখা গেল। নবাব দেখিলেন, বীরচন্দ্র প্রভুর প্রভাবে—

* * * * *

সপ্ততাল অগ্নি হেন জ্বলিত হইল।
কেহ তাতে পুড়ি মরে কেহ শীতে কাঁপে॥
নাড়া সব প্রাচীর লঙ্ঘিল এক লাফে॥
কতদূর যাই বৈসে উচ্চ টঙ্গি পরে।
কৌতুক করিয়া সব মূত্র ত্যাগ করে॥
মুশল ধারেতে মূত্র সবে ছাড়ি দিল।
মহাশব্দ হই সহর ভাসিয়া চলিল॥

নাগরিকগণ ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করিয়া নবাববাড়ীমুখে ছুটিতে লাগিল। আবাস রাজবাড়ীর গৃহ, কক্ষ, প্রাঙ্গণ, সমস্ত প্লাবিত হইতে দেখিয়া, অন্তঃপুরচারিণীগণ মহাব্যস্তে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গৃহের অবরোধ ভাঙ্গিয়া দরবারকক্ষ অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। সে সময় নবাব বসিয়া বসিয়া, গোসাঞীর কথাই ভাবিতেছিলেন, অকস্মাৎ বিনা পূর্ব্ব-সূচনায় জল-প্লাবন ও অগ্নি উদ্গীরণ দেখিয়া এবং নাগরিকবর্গ ও আত্মীয়গণের ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভয়ে বিহ্বল চিত্তে "যাবনিক ভাষায় স্মরি নারায়ণ" এবং সুবুদ্ধি দেওয়ানের উত্তেজনায় অবিলম্বে—

ব্যস্ত হইয়া রাজা যায় পথব্রজে চলি।
বাপহ গোসাঞী বলি এই বোল বলি॥
গলায়ে কুঠার বান্ধি জোর হাত হই।
নৃসিংহ দাসের আগে পড়িলেক যাই॥
রক্ষ রক্ষ মূঢ়জনে জিন্দা পীর তুমি।
কৃপা কর গোসাঞী কি স্তব জানি আমি॥

ইত্যাদি

নবাব ইত্যাকার বহুবিধ অনুনয় বিনয় সহকারে নৃসিংহ দাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তাঁহাকে এই সকল দৈব উৎপাত নিবৃত্তি করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া তদীয় গুরুর সকাশে যাইতে কাতরতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নৃসিংহ দাস নবাবের কাতরতায় নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বীর চন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। তৎ-সমীপে উপস্থিত হইয়া নবাব বীর চন্দ্রের পদপ্রান্তে স্বীয় পীর (গুরু) কে দেখিতে পাইলেন। পীর অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত কৃষ্ণ কথায় নিমগ্ন আছেন। নবাব চমৎকৃত হইয়া প্রভুর নিকট নিজের কথা ব্যক্ত করিলেন।—

"মোর মনে গর্ব্ব এই ছিল অতিশয়।
হিন্দুপীর হইতে মোর পীর শ্রেষ্ঠ হয়॥
এইত মোহর শাস্ত্র কোরাণেতে কহে।
তাহা দেখি সাক্ষাতে অন্যথা সব বহে॥
মোর পীর শত শত লুটে পদতলে।
দেখিয়া ম্লেচ্ছ রাজা বিস্ময় মানিলে॥
হিন্দুপীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর সবার।
ঐছে ম্লেচ্ছ রাজ-মনে ভাবে আপনার॥"

তৎপর নৃসিংহ দাস প্রভুর স্থানে নবাবের পরিচয় জ্ঞাপন করিলে এবং নবাব পুনরায় দৈন্যতা ও কাতরতা প্রদর্শন করিতে লাগিলে

"হাসি প্রভু তারে কৈলা শুভ দৃষ্টিপাত।
দণ্ডবৎ করি রাজা করে জোড় হাত॥"

নবাব বীরচন্দ্রের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। তাঁহার চিত্ত কৃষ্ণভাবময় হইয়া উঠিল এবং শিষ্যগণ সহ কতিপয় দিবস হরি সংকীর্ত্তন রসে ডুবিয়া থাকিলেন। ইহাই হইল বৈষ্ণব সাহিত্যের লিখিত ইতিবৃত্ত।

কুলজ্ঞদের বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায়, নবাব মহাত্মা গঙ্গা হরির অলৌকিক যোগবল দর্শনে সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া, পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন দান গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। গঙ্গাহরি প্রথমতঃ যবন-রাজের দান প্রতিগ্রহ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অসম্মতি প্রকাশ করেন। শেষে নবাবের একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বলিলেন,—"আমার নিজের কোনই প্রয়োজন নাই। যদি নিতান্তই আপনি সদয় হইয়া দান করিতে চান, তবে বাঢ় দেশের বীরভূম জেলার অন্তর্গত আমার গুরুদেব নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান একচক্রা গ্রাম খানি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীবঙ্কিম দেবের (বাঁকা রায়ের) সেবা পূজার ব্যায় নির্ব্বাহার্থে দান করুন।" নবাব সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাম্রপাত্রে দান-পত্র লিখিয়া গঙ্গা হরির হস্তে অর্পণ করেন। গঙ্গাহরি দান প্রাপ্তি মাত্র, উক্ত তালুক শ্রীবঙ্কিম দেবের চির কালের সেবা পূজা স্বচ্ছন্দে চালাইবার উদ্দেশ্যে গুরুপুত্র বীরচন্দ্র দেবকে অর্পণ করেন এবং তাম্রপাত্রের নিম্নে নিজের নাম খুঁদিয়া প্রভু-পুত্রের হস্তে প্রদান করেন।(১) এই একচক্রা গ্রাম

(১) বীরচন্দ্র প্রভুর তিন পুত্র, গোপীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র। তাঁহার তিরোভাব পর, প্রথম পুত্র শ্রীপাটনাতাতে (বর্ত্তমান নাম সম্ভবতঃ বীরচন্দ্রপুর,) দ্বিতীয় পুত্র মালদহ গাদি এবং তৃতীয় পুত্র খড়দহ গাদিতে প্রতিষ্ঠিত হন। শুনিতে পাওয়া যায়, বিপ্রঘাটার ও রামতলার নবীনকিশোর গোস্বামীদিগের এক পূর্ব্ব পুরুষের সহিত, খড়দহের গোস্বামী-সন্তানদের, এই বীরচন্দ্রপুর তালুক লইয়া মোকদ্দমা হয়। মোকদ্দমা বর্ত্তমান হাইকোর্ট কর্ত্তৃক প্রথমোক্ত গোস্বামীদিগের অনুকূলে ডিক্রি হয়। আমরা বহু অনুসন্ধানেও এই মোকদ্দমার বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমার কতিপয় বন্ধু বান্ধবকেও এই বিবরণ সংগ্রহের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু

অতঃপর বীরচন্দ্রপুর নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ হয়।—

* * * *

ক্রমে ক্রমে চলি আইলা একচক্রা পুরী॥
নিত্যানন্দ প্রভুর সে জন্মস্থান হয়।

* * * *

সেই গ্রামে তিন দিন করিলা বিশ্রাম।
বীরচন্দ্রপুর বলি থুইলা তার নাম।"

এই তালুক এখনো নিত্যানন্দ বংশীয় প্রভুদের অধিকারে আছে।

অতঃপর নবাব গঙ্গাহরিকে নিজের ব্যবহার নিমিত্ত কিছু গ্রহণ জন্য অনুরোধ করিলেন। গঙ্গাহরি অবশেষে প্রার্থনা করিলেন,—"যদি নিতান্তই আমার নিজের নিমিত্ত কোন দান গ্রহণ করিতে হয়, তবে এই আদেশ করুন যে, আমার বসত গ্রাম আমহাটীতে যে ভিটায় আমার বাসস্থান ও দেবালয় স্থাপিত আছে, তাহা যেন অতঃপর আমি ও আমার বংশীগণ আজন্ম নিষ্কর স্বত্বে ভোগ দখল করিতে পারে।" নবাব গঙ্গাহরির এ প্রার্থনা পূর্ণ এক তাম্র দান-পত্র লিখিয়া দেন।

এই ঘটনা হইতে গঙ্গাহরির নাম ও খ্যাতি দিগ্‌দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এবং পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তাঁহার আসন বৈষ্ণব সমাজের ৬৪ মহান্তের সম-পর্য্যায় ভুক্ত হয়।*

মোকদ্দমার সন নম্বর অভাবে তাঁহারাও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হাইকোর্টের রায় সংগৃহীত হইলে, এ সম্বন্ধে কিছু নূতন তত্ত্ব জানা যাইতে পারে।

* কুলজ্ঞগণ কি প্রমাণের বলে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমি বুঝি নাই। আমি ৬৪ মহান্তের নামের তালিকা বহু অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াও তাহাতে মহাত্মা গঙ্গাহরির নাম প্রাপ্ত হই নাই। হইতে পারে তাঁহার অপর কোন নাম ছিল, এবং সেই নামেই তিনি বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হন। সভ্যগণের

মুসলমানদিগের বাদসাহ-ঘটিত আর একটী উপাখ্যান কুলজ্ঞদিগের গ্রন্থে দেখিতে

অবগতির নিমিত্ত নিম্নে আমরা অষ্ট প্রধান মহান্ত, ও ৬৪ মহান্তের নাম লিপিবদ্ধ করিলাম। যথা—

প্রধান মহান্ত চৌষট্টি মহান্ত

১। স্বরূপদামোদর, সহচর—
১। চন্দ্রশেখরাচার্য্য, ২। আচার্য্যরত্ন, ৩। রত্নগর্ভ, ৪। গরুড়গোবিন্দ, ৫। মুকুন্দদেব, ৬। দামোদর পণ্ডিত, ৭। কৃষ্ণদাস ঠাকুর, ৮। কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর।

২। রামানন্দ রায়, সহচর—
১। মাধবাচার্য্য, ২। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, ৩। রামচন্দ্র, ৪। বাসুদেব দত্ত, ৫। নন্দনাচার্য্য, ৬। শঙ্কর ঠাকুর, ৭। সুদর্শন ঠাকুর, ৮। যুবুদ্ধি মিশ্র।

৩। শিবানন্দ সেন, সহচর—
১। শ্রীরাম পণ্ডিত, ২। জগন্নাথ দাস, ৩। জগদীশ পণ্ডিত, ৪। সদাশিব কবিরাজ, ৫। রায় মুকুন্দ, ৬। মুকুন্দানন্দ, ৭। পুরন্দরাচার্য্য, ৮। নারায়ণ বাচস্পতি।

৪। রামানন্দ বসু, পার্ষদ—
১। মধু পণ্ডিত, ২। মকরধ্বজ কর, ৩। দ্বিজ রঘুনাথ, ৪। বিষ্ণুদাস, ৫। পুরন্দর মিশ্র, ৬। গোবিন্দাচার্য্য, ৭। পরমানন্দ গুপ্ত, ৮। বলরাম দাস।

৫। গোবিন্দ ঘোষ পার্ষদ—
১। কাশীমিশ্র, ২। শিখিমাহাতি, ৩। কালীদাস, ৪। শ্রীমান পণ্ডিত, ৫। কবিচন্দ্র ঠাকুর, ৬। হিরণ্যগর্ভ, ৭। জগন্নাথ সেন, ৮। দ্বিজ পীতাম্বর।

৬। বাসুদেব ঘোষ, পার্ষদ—
১। রাঘব পণ্ডিত, ২। রুদ্র পণ্ডিত, ৩। মকরধ্বজ পণ্ডিত, ৪। কংসারি সেন, ৫। জীব পণ্ডিত, ৬। মুকুন্দ কবিরাজ, ৭। ছোট হরিদাস, ৮। কবিচন্দ্র আচার্য্য।

৭। মাধব ঘোষ, পার্ষদ—
১। মকরধ্বজ সেন, ২। বিদ্যাবাচস্পতি, ৩। গোবিন্দ ঠাকুর, ৪। কবি কর্ণপুর,

পাওয়া যায়। কথিত আছে, মহাত্মা গঙ্গা হরি শেষ জীবনে হরিনাম প্রচার ব্যপদেশে নানা দেশে ও তীর্থ পরিভ্রমণ করনান্তর গুরুর আদেশে নৈমিষারণ্য গমন করিয়াছিলেন। তথায় পাঁচ বৎসর কাল পরমহংস গোকুলানন্দ স্বামীর নিকট তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তৎপর তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কিয়ৎকাল হরিদ্বারে অবস্থান করিয়া রাজধানী দিল্লি নগরীতে উপনীত হন। তৎকালে বাদশাহ বাবর দিল্লীর অধিপতি। গঙ্গাহরি তথায় রামসেবক নামে এক শিষ্যের আলয়ে অবস্থান করেন এবং অচিরাৎ একজন তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন ক্ষমতাবান সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়েন। প্রত্যহ নানা স্থান হইতে বহুতর ব্যক্তি তাঁহার প্রসাদ কামনায় তথায় আগমন করিতে থাকে। এই সময় সম্রাট-পুত্র যুবরাজ হুমায়ুন সাংঘাতিক পীড়িত ছিলেন। নানারূপ হাকিমী ও কবিরাজী চিকিৎসাতেও কোনরূপ ফল ফলে না। চিকিৎসকও সম্রাট-যুবরাজের জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন। অবশেষে গঙ্গাহরির বিষয় সম্রাট অবগত হইলেন এবং একদা রজনীতে একাকী অতি সংগোপনে রামসেবকের গৃহে উপস্থিত হইয়া পুত্রের জীবনের নিমিত্ত গঙ্গাহরির শরণাপন্ন হইলেন। প্রথমতঃ গঙ্গাহরি সম্রাট-পুত্রকে আরোগ্য করিতে বা কোন ঔষধ দিতে সম্মত হন না। পরিশেষে সম্রাটের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারায়, নিজের ঝুলি হইতে এক প্রকার ভস্ম বাহির করতঃ সম্রাটের হস্তে দিয়া, তাহা গঙ্গা জলসহ পুত্রকে সেবন করাইতে বলিয়া দেন। বাবর সাধুর চরণে প্রণাম করতঃ আনন্দিত হৃদয়ে ঔষধ লইয়া ভবনে গমন করেন এবং সাধুর উপদেশানুসারে পুত্রকে ঔষধ খাওয়াইবার আয়োজন করিতে থাকেন।

কিন্তু অবিশ্বাসী মন্ত্রীবর্গ ও চিকিৎসকগণ এই বিষয় জানিতে পারিয়া নবাবের নিকট নানারূপ আপত্তি তুলিয়া তাঁহার মনে সংশয় জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—"ফকিরের এই ভস্ম খাওয়াইলে হিতে বিপরীত ঘটিবে। সন্ন্যাসীর যদি কোন ক্ষমতা থাকে, তবে ঔষধ কেন—বিনা ঔষধে আরোগ্য করুক?" তখন ধর্ম্মাত্মা বাবর মনে নানারূপ তর্ক বিতর্ক করতঃ বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। প্রধান মন্ত্রীও ঔষধ সেবনের প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিলেন। শেষে অনন্যোপায় হইয়া মহাত্মা বাবর সেই রজনীতেই পুনরায় গঙ্গাহরির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রকৃত বৃত্তান্ত গোপন করতঃ ঔষধে কোন ফল হইল না বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তচ্ছ্রবণে মহাত্মা গঙ্গাহরি হাস্য করিয়া বলিলেন—"আমিত পূর্ব্বেই বিধর্ম্মী ও অবিশ্বাসীকে ঔষধ দিতে অসম্মত হইয়াছিলাম। যাহা হোক্, এক্ষণে আর মিথ্যা কথা

৫। শ্রীকান্ত ঠাকুর, ৬। মাধব পণ্ডিত, ৭। প্রবোধানন্দ সরস্বতী, ৮। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

৮। গোবিন্দানন্দ ঘোষ, পার্ষদ—

১। বিজয় রাঘব, ২। বল্লভ ঠাকুর ৩। রাধাকৃষ্ণ দাস, ৪। বনমালী দাস, ৫। শ্রীনিধি পণ্ডিত, ৬। শ্রীকর পণ্ডিত ৭। লক্ষ্মণাচার্য্য, ৮। পুরুষোত্তম পণ্ডিত।

"শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা পদ্ধতি" "ভোগমালা বিবরণ" প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বোক্ত তালিকা আমরা সঙ্কলন করিয়াছি। এই তালিকা যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, সে কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না। সুধী পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিবেন। লেখক।

বলিয়া ফল কি? আমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি।" সাধুর কথায় ধর্ম্মাত্মা বাবর বড়ই অপ্রতিভ হইয়া করযোড়ে সাধুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে করিতে বলিলেন,—"যাহাতে বিনা ঔষধে আমার প্রাণ ধিক পুত্রের প্রাণরক্ষা হয়, আপনি কৃপা করিয়া তাহারই ব্যবস্থা করুন।" সম্রাটের বাক্যশেষে গঙ্গাহরি অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন,—"আপনি সম্রাট, আপনার কোন দোষ দেখি না। যাই হোক্, আপনি যখন নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, তখন এক কথা শুনুন! হরিদ্বারের সার্দ্ধ তিনক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অশ্বত্থ বৃক্ষ সদৃশ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষের উপর একটী লতা জন্মিয়াছে; সেই লতা হইতে একটী পাতা পাড়িয়া আনিয়া দিতে পারিলে, আপনার পুত্রের জীবন রক্ষার উপায় করিতে পারি। কিন্তু পত্র ছিন্ন না হয় বা তাহাতে সূর্য্যের আলোক পতিত না হয়,—এজন্য আবৃত অবস্থায় আমার নিকট আনিতে হইবে।"

সম্রাট হতাশ ভাবে বলিলেন,—"সেই পার্ব্বতীয় বৃক্ষ কেইবা চিনিবে, আর কেইবা আনিতে সক্ষম হইবে? বুঝিলাম, আমার পুত্র আর আরোগ্য হইবে না।"

সম্রাটের এইরূপ কাতরতায় গঙ্গাহরি বড়ই ব্যথিত হইলেন। পরে সম্রাটকে ঘরের বারেন্দায় বসাইয়া রাখিয়া নিজে গৃহের ভিতর যাইয়া অর্গল বন্ধ করিলেন। প্রায় একঘণ্টা পর দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, সম্রাট সাধুর হস্তে কয়েকটী পাতা দেখিতে পাইলেন। গঙ্গাহরি সম্রাটকে একটী মন্ত্র শিখাইয়া দুইটী পাতা তাঁহার হস্তে প্রদান করতঃ বলিয়া দিলেন যে, এইমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে পাতাটী পীড়িতের গাত্রে বুলাইতে হইবে। এই বলিয়াই মহাত্মা গঙ্গাহরি চমকিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন,—"আপনি তো এ ব্যাধির তেজ সহ্য করিতে পারিবেন না। পীড়িতের গাত্রে যিনি এই পাতা বুলাইবেন, তিনিই এই ব্যাধি-আক্রান্ত হইয়া নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। যদি পূর্ব্বপ্রদত্ত ঔষধ সেবন করান তো কোন ক্ষতিই হইবে না, নিশ্চিতই যুবরাজ আরোগ্য হইবেন।" সাধুর কথায় সম্রাট উত্তর করিলেন,—"নিজে মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু পুত্রের প্রাণরক্ষা করিতেই হইবে।" অবশেষে সম্রাট মন্ত্র শিখিয়া, পত্র লইয়া রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন এবং সাধুর উপদেশ মত পীড়িত পুত্রের গাত্রে পত্র ফিরাইতে লাগিলেন। সে রাত্রি কিছুই বুঝা গেল না। পরদিবস অনাহারে থাকিয়া সম্রাট পঞ্চদশবার মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইদিন হইতে হুমায়ূন যে ভাবে আরোগ্য হইতে লাগিলেন, বাবর সেই মাত্রায় রোগাক্রান্ত হইতে লাগিলেন। অবশেষে যে দিন সম্রাট-পুত্র সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন, সেইদিন এই পুত্রস্নেহাতুর ও ধর্ম্মাত্মা পিতা অনন্ত সমাধি-নিমগ্ন হইলেন। সারা দিল্লী শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মহাত্মা গঙ্গাহরি কাশীধামে আসিয়া সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের লিখিত এই সময়ের ইতিবৃত্তাদিতে যুবরাজ হুমায়ূনের এবম্প্রকার আরোগ্যের বিষয় লিখিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে যে একজন হিন্দুসাধুর কৃতিত্ব বা প্রভাব ছিল, তাহা ঘুণাক্ষরেও উল্লিখিত হয় নাই। আমরা এস্থলে memoirs of Baber নামক গ্রন্থ হইতে সম্রাট বাবরের মৃত্যুকাহিনী সভ্যগণকে শুনাইতেছি।—'এক-

বার হুমায়ুন ঘোরতর কাতর হইয়া পড়েন —তাহার জীবনের কোন আশাই ছিল না। আবুল বাকা (Abul Baka) নামক এক প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ব্যক্তি বাবরকে বলেন যে,— এইসব ক্ষেত্রে পীড়িত ব্যক্তির কোন নিকট আত্মীয় ব্যক্তি, যদি তাহার অতিপ্রিয় এবং অতি মূল্যবান কোন পদার্থ উৎসর্গ করেন, তবে তদ্বিনিময়ে পরমেশ্বর পীড়িত ব্যক্তির পরমায়ু কিছুদিবস বাড়াইয়া দিয়া থাকেন। বাবর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হন, —যদি তাহাতে হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করেন। ওমরাওগণ এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা হইতে সম্রাটকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বিধিমতে চেষ্টা করিলেন—এবং আগরায় রক্ষিত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান যে হীরকখণ্ড আছে, তাহাই দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—সম্রাট সংকল্প হইতে তিল মাত্র বিচলিত হইলেন না। মুসলমান ইতিবৃত্তকারগণ বলেন যে, এই সময় হইতে সম্রাট-পুত্র যে মাত্রায় আরোগ্য হইতে আরম্ভ করেন, ঠিক সেই অনুপাতে সম্রাট রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। অবশেষে হুমায়ুন সম্পূর্ণ সুস্থ ও আরোগ্য হওয়া মাত্র, সম্রাট বাবর অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন।* ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। সম্রাটের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎ সমকালে বাঙ্গালার মস্‌নদে নবাব মহাম্মদ শাহ সমাসীন ছিলেন। (১) এক্ষণে এই দুই বিভিন্ন বৃত্তান্ত হইতে সত্য নিষ্কাশনের ভার সুধী শ্রোতা-

* Vide Memoirs of Baber p 427

(১) Vide Stewart's History of Bengal

গণের প্রতি অর্পণ করিয়া, আমি আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গঙ্গাহরি গোস্বামীর রাধাবল্লভ নামে এক পুত্র ছিল। পুত্রের বয়স যখন পঞ্চবিংশতি বর্ষ, সেই সময় তিনি শেষ বার তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হন। কথিত আছে, ফাল্গুন মাসে পঞ্চম দোলের দিবস, তিনি বৃন্দাবন প্রাপ্ত হন। তৎবংশীয়দিগের নিকট শুনিয়াছি যে, অধিক রাত্রিতে এখনও তাঁহারা আমহাটার ৺শ্যাম রায় বিগ্রহের মন্দিরের মধ্যে খড়ম পায়ে দিয়া বিচরণ করিবার শব্দ শুনিতে পান এবং তাহা যে মহাত্মা গঙ্গাহরির কীর্ত্তি, ইহারা তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

এই স্থলে "নাড়ি" সৃষ্টির বিবরণটী শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইতেছি। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, গঙ্গাহরি গোস্বামীর হুঙ্কারে ঢাকা নগরীতে নাড়া-নাড়ির উৎপত্তির বিবরণ কুলজ্ঞদিগের স্বকপোল-কল্পিত। তৎপূর্ব্বেই ১২০০ শত নাড়ার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ইহারা বীরচন্দ্র প্রভুর অনুগত শিষ্য ছিল। ইহারা প্রভুর সেবা করিত এবং তিনি কোন স্থানে গমন করিতে উদ্যত হইলে, ইহারা অগ্রে অগ্রে "বীর বীর" নাদে সিংহনাদ করিতে থাকিত। যথা—

"বারশত নাড়া আর তেরশত নাড়ী।
কেহ বহে গঙ্গাজল কেহ শোধে বাড়ী॥
বির বির করি নাড়া করে সিংহনাদ।
কারে নাহি ভয় বীর চন্দ্রের প্রসাদ॥"

নিত্যানন্দ-বংশমালা—৩য় স্তবক।

অন্যত্র,—

"তবে বীরচন্দ্র প্রভু চারিনাড়া সঙ্গে।
আইলেন চেঙ্গাভা গ্রাম (?) প্রভুর রঙ্গে॥"

গতিগোবিন্দ-প্রণীত বীররত্নাবলী—
তৃতীয় অধ্যায়।

এক্ষণে নাড়ীর উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণ করুন। একদা মাতা জাহ্নবা দেবী রন্ধন করিতেছেন, বারশত নাড়া সমস্ত রজনী সংকীর্ত্তন রঙ্গে অতিবাহিত করতঃ ক্ষুধায় কাতর হইয়া, মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া আহার্য্য প্রার্থনা করিল। জাহ্নবা দেবী বলিলেন, ক্ষণকাল বিলম্ব কর, রন্ধন প্রায় শেষ। এক্ষণেই ৺শ্যামসুন্দরের ভোগ হইবে, তৎপরে পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করিও। কিন্তু—

শুনি সে বচন নাড়াগণ কহে তবে॥
ক্ষুধায় পোড়য়ে পেট রহিতে না পারি।
জ্বলিল জ্বলিল বলি কহয়ে ফুকারি॥
এতেক কহিতে অগ্নি ঘরেতে জ্বলিল।
দেখিয়া সকল লোক কোলাহল কৈল॥

এই কোলাহল শুনিয়া বীরচন্দ্র প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার বুঝিয়া

অমৃত নয়নে প্রভু চাহে কুতুহলে॥
ততক্ষণে অগ্নি সব নির্ব্বাণ হইল।
মহা প্রভু বীরচন্দ্রের মহা ক্রোধ হইল॥

তিনি নাড়াগণের প্রভাব হ্রাস এবং দণ্ড বিধান করিবার উদ্দেশে—

নাড়ী সৃষ্টি কৈল প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
তেরশত নাড়ী সৃষ্টি ইঙ্গিতে করিলা।
ভুবনমোহিনী সব রূপেতে উজ্জ্বলা।
ষোড়শ বৎসর সবে যৌবনে উন্নত।
দেখিয়া সকল নাড়া হইল মোহিত॥

নাড়াগণ ক্ষুধা ভুলিয়া নাড়ীর মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। কেহ কেহ ২।৩টী করিয়া নাড়ী দখল করিল। আবার কতিপয় বিবেক-সম্পন্ন নাড়া কামিনীর কুটিল কটাক্ষে না ভুলিয়া "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনং" নীতির অনুসরণ করিল।

হেন মতে নাড়াগণে প্রভুদণ্ড কৈল।
সেই হইতে সম্ভোগী (?)বৈষ্ণব সৃষ্টি হইল॥
বৃন্দাবন দাস।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই সকল অলৌকিক বিবরণ, পাশ্চাত্য শিক্ষা-গর্ব্বিত পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণের নিকট অত্যুক্তি ও রূপকালঙ্কার বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বুঝেন না যে,—"নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ।" ইহারা মনে করেন, এমন একদিন আসিবে, যখন জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির সহিত ভগবানের নাম পর্য্যন্ত মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে চিরদিনের তরে অন্তর্হিত হইবে। এই সকল নাস্তিক ও সংশয়বাদীদের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া কোন আস্তিক পুরুষই নিরস্ত থাকিতে পারেন না। বর্ত্তমান কালে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া, তাহাদের বাক্য নিতান্ত অসার,তাহা বেশ বুঝা যায়। পাশ্চাত্য সুধী পণ্ডিতবর্গও এক্ষণে বুঝিয়াছেন যে, আমরা যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইব, ততই উপাসনার ভাব—সাধনার প্রণালী পরিপুষ্ট হইবে। কারণ সাধনাই ঐশীভাবের সংগীতময় ভাবোচ্ছ্বাস (musical expression of sentiments)* সুতরাং বলা যাইতে পারে, বিদ্বেষ-শূন্য হৃদয়ে বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ সমূহের ঘটনাগুলিকে আলোচনা করিতে পারিলে, বৈষ্ণব সাধুর জীবনের ও তাঁহার কার্য্য-কলাপাতের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইতে পারিবে। শিখা-কণ্ঠিধারী বাবাজীদের শাস্ত্র বলিয়া বৈষ্ণবীয় গ্রন্থকে হতাদর করিলে চলিবে না। বৈষ্ণবীয় সাধুগণের জীবনের জলন্ত বৈরাগ্য ও জীবন্ত প্রেম ভক্তি ও ভাবের কথা স্থির

* পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সার প্রণীত Ecclesiastical institution গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ধীর চিত্তে আলোচনা করিলে, নিশ্চয়ই পুরস্কার মিলিবে। তাহাদের আলোচনারই এমন ফল যে, পাঠকের বা শ্রোতার হৃদয় ও জীবন উন্নত না হইয়াই যায় না। আলোচনার সময় মাত্র ইহাই মনে রাখিতে হইবে, বৈষ্ণব লেখকগণ সকলেই অতি জ্ঞানী ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা কেহই স্বেচ্ছা-ক্রমে স্বীয় গ্রন্থে অসত্য বা অলীক ঘটনার অবতারণা করেন নাই। মহীয়সী প্রাজ্ঞ ও ক্ষমতাসম্পন্ন ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাপুরুষগণের প্রতি সর্ব্বসাধারণ জনগণের অবিচলিত ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস নিবন্ধন যে কোন অলৌকিক বা অদ্ভুত ঘটনা ধর্ম্ম-জগতে দেখা যায় না, তাহা বলিতেছি না। তবে তাহাতে স্বেচ্ছা-কৃত অসত্যের দোষারোপ অমার্জ্জনীয় এবং তাহা গ্রন্থকারের অগৌরবের বিষয়।

আমি বহুক্ষণ ধরিয়া সভ্য মহোদয়গণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। সম্ভবতঃ অনেকের কর্ণপীড়নকারী কর্কশভাষায় লিখিত এই প্রবন্ধ শ্রবণ করিতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। তাই সর্ব্বশেষে বৈষ্ণবগণের চরণে আমি কোটী প্রণিপাত পূর্ব্বক অদ্যকার মত বিদায় লইলাম। আজি আমি আমার স্বদেশবাসী এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, তপঃনিষ্ঠ, হরিভক্ত, বৈষ্ণব, সাধু পুরুষের চরিত্র-চিত্র সর্ব্বপ্রথম দেশের শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে অঙ্কিত করিতে পারিয়া, কৃতার্থ ও ধন্য হইলাম। মহাত্মা গঙ্গাহরির চরণে আমার কোটী প্রণিপাত।

"কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ 'ভক্ত বড়' করি মানে।
তাহাতে বহুত শাস্ত্র বচন প্রমাণে।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

সুয়া দুয়া।

(১)

আমি ত জানি না প্রিয়ে কেবা সুয়া দুয়া,
কে তোমরা চিনি চিটা, চন্দ্রপুলি চিতই পিঠা,
কেবা সে মাল্‌সা ভোগ কেবা মালপুয়া।
কেবা সে আমির্ত্তি খাজা,
কেবা সে আঠার ভাজা,
কেবা সে দিল্লীকা লাড্ডু কেবা সে ছাতুয়া।
কেবা সে অমৃতসর,
পদ্মবনে মনোহর,
পানা পচা খানা ডোবা কেবা পাতকুয়া!
কে বদরী কেবা আম,
কে মনক্কা কে বাদাম,
বেদানা দাড়িম্ব কেবা ডেফল ডহুয়া।
কে কমল কে শিমূল,
কে গোলাপ গেন্দা ফুল,
আমি ত জানিনা কেবা মাধবী মহুয়া।
কেবা কাক কেবা পিক,
নাহি জানি কে অধিক,
কে আমার তোতাপাখী কেবা কাকাতুয়া!
কার বা অমৃত স্পর্শ,
বাড়ায় আনন্দ হর্ষ,
কার বা বিষের জ্বালা কেবা বিছা শূয়া!
কার শিরে পদ্মমণি,
কেবা সে স্পর্দ্ধিতা ফণী,

মাটীতে লুকায় মুখ.কেবা সে কেচুয়া।
কেবা আদবের 'পান্না',
কে অনাদরেব 'আন্না',
আমি ত জানিনা মেবা কৌন কৌন হুযা,—
কে আমাব সুয়াবাণী কে আমাব হুযা।

(২)

আমাব সকলি প্রিয সকলি সমান,
পবম পুরুষ আমি,
আমি সকলেব স্বামী,
আমি সকলেব আত্মা সকলেব প্রাণ।
অনন্ত প্রকৃতি নাবী,
অনন্ত রূপেতে তারি,
অনন্ত অনন্ত কাল আছি ক্রীড়াবান্।
ভোগে নাই বিবমিষা,
কি বিষম মহাতৃষা,
কিবা দিবা কিবা নিশা একই সমান।
নানা বসে নানা জনা,
তোমবা সে কণা কণা,
উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ভবে সদা কবি পান,
তোমবা সে নানা শোভা,
আমি তাহে চিব ডোবা,—
চিবমগ্ন চিবমুগ্ধ চিব মুহ্যমান।
সোহাগে সবাই বড,
কেহ নহে তম তর,
অনন্ত সিন্ধুর মত করি স্তুতি গান,
সঙ্গমে মিলনে সুখে,
তটিনীর বুকে বুকে,
ওঙ্কাবে হুঙ্কাব উঠে—নভ প্লবমান!
ও আমাব সোণা যাদু!
বাহবা, কেমন সাধু,
খেলায়ে ছিপেব মাছ শেষে দেও টান,
কেমন কথাব পেঁচ,
বোবো খেতে দোণ সেঁচ,
টুটা ফাটা জমিনে সে জলে ডাকে বান!
অন্তরে সলিল ভবা,
বাহিবে সে বালু মবা,
ও আমার সোণামুখি চীব পরিধান,
কোন্ বন করি আলা,
পরিলে মৃণাল বালা,
বাকল বাধিযা গাছে পাছে লাগে টান!
ও মোর কদম্ব-কবি,
মানময়ী জলছবি,
রসে ভিজে ওঠে কি যে রূপ মূর্ত্তিমান,
কি মোহিনী কলা লীলা,
ইন্দ্রধনু শুধু ছিলা!
আকাশ ফেলিলে গিলা বেজায় সেয়ান!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

রামমোহন রায়ের বিশ্বদৌত্য।

"Not the future of India alone, we stand on the eve of an unprecedented intermingling of East and West The European and the Asiatic streams of human development, which have often tinged each other before, are now approaching a confluence which bids fair to form the one ocean-river of the collective progress of mankind In the presence of that Eastern Question,—with its infinite ramifications, industrial, political, moral and religious,—our international problems of the passing hour, even the gravest of them, seem dwarfed into parochial pettiness The nearing dawn of these unmeasured possibilities only throws into clearer prominence the figure of Rajah Ram Mohan Ray. He was, if not the prophetic

type, at least the precursive hint of the change that is to come"

সরল-হৃদয় বালক বালিকা ও সাদ্ধী নারীর মুখে পৃথিবীতে দেশে কালে অনেক সময় যে বিধাতার বাণী প্রচারিত হইয়াছে, ভারতবর্ষ ও ফ্রান্সের ইতিহাস হইতে তাহা এ দেশের অনেকেই স্মরণ করিতে পারে। এই প্রবন্ধের উপরি-উদ্ধৃত অসাধারণ কথাটীকেও আমি একটী মহাপ্রতিভাশালিনী, অনন্য-সাধারণ ইংরেজ-রমণীর মুখে প্রত্যাদিষ্ট বাণী বলিয়া বিশ্বাস করি। আর আশা করি, এই *মহতী বাণী আমাদের দেশের চিন্তাশীল* নরনারীদিগের আলোচ্য বিষয় হইবে। তিনি বলিয়াছেন,—"শুধু ভারতের ভবিষ্যৎ নয়, আমরা আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক অপূর্ব্ব মিলনের শুভসন্ধি-ক্ষণে দণ্ডায়মান হইয়াছি। ইয়োরোপীয় ও এশিয়াবাসী মানবের স্বাভাবিক উন্নতির গতি, যাহা সময়ের গুণে ইতিপূর্ব্বে পরস্পর অল্প বিস্তর সংক্রামিত হইয়াছিল, সেই উভয় সভ্যতা এখন এমন এক সমন্বয়ের আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, যাহা সমগ্র মানবজাতির সার্ব্বজনীন উন্নতির এক অভিন্ন বিশাল স্রোতে পরিণত হইবে, আশা করা যায়। এটী প্রাচ্য দেশাগত শ্রেষ্ঠতর প্রস্তাব; এই প্রস্তাবের মধ্যে অশেষ প্রশ্ন,—তন্মধ্যে শিল্প বাণিজ্য, সমাজ-নীতি, রাজনীতি, ও ধর্ম্মনৈতিক বিষয় সকলের গুরুত্বের নিকট আমাদের ইয়োরোপীয় জাতিদের বর্ত্তমান আলোচ্য সমস্যা সকল তুলনায় অতি ক্ষুদ্র গ্রাম্য আলোচনার ন্যায় বোধ হয়। এই অসীম সম্ভাবনার অদূরবর্ত্তী উষালোক ক্রমশঃ উজ্জ্বলতররূপে শুধু রাজা রামমোহন রায়ের মূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। অবতারত্বের লক্ষণ যদি তাঁহাতে নাও থাকে, তথাপি পৃথিবীর যে পরিবর্ত্তন আসিতেছে, তাহার অগ্রবর্ত্তী প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত তিনিই।"

একটী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে পৃথিবী আপনার বলিয়া দাবী করিতেছে, ও তাঁহাকে উনবিংশ-শতাব্দীর নবযুগের প্রতিনিধিরূপে মান্য করিতেছে। তিনি যে বঙ্গবাসী, তাঁর সঙ্গে আমাদের যে রক্তের সম্বন্ধ, এই সত্যকথা যদি আমরা অনুভব করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগেও যে আমাদের জাতীয়-মর্য্যাদা অনুভব করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহা বুঝিতে পারিব। উপস্থিত আমাদের মত পাতিত্য, হীনতা ও দুর্ব্বলতার মধ্যেও আমাদের বীরপ্রসবিনী মাতৃভূমির উদ্দেশে প্রাণের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে ন্যায়-সঙ্গত অভিলাষ হয়, যখন সুদূর প্রতীচ্য পৃথিবী হইতে মনীষিগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের স্বদেশবাসী এক ব্যক্তির উদ্দেশে বলিতেছেন,—"পৃথিবীর এক অসীম সম্ভাবনার অদূরবর্ত্তী উষালোক ক্রমশঃ উজ্জ্বলতররূপে শুধু সেই মনুষ্যটীর মূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে।"

ইহাতে জাতীয় আত্মসম্মান অনুভব না করেন, হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে এমন বাঙ্গালী কেহ থাকিতে পারে না।

কিন্তু সেই মহাত্মাকে তাঁহার সম-সাময়িক স্বদেশবাসী, এমন কি, তাঁহার পরম আত্মীয় ব্যক্তিগণ, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাভ্যা-সের গোঁড়ামীবলে অবর্ণনীয় নির্য্যাতন করিয়াছিল! সেই মহাত্মার স্বহস্তলিখিত আত্মকথা পাঠ করিয়া এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহার মনের ভাব সুস্পষ্ট জানিতে পারি, এবং তাহাতে বিলক্ষণ হৃদ্বোধ হয় যে, তিনি এক অপূর্ব্ব স্বদেশবাৎসল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া গুরুতর সাধন-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে মিঃ ডিগ্‌বিকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন,—"বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সহিত সর্ব্বপ্রকার উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ ও প্রত্যক্ষ আত্মঘাতী যে অবান্তরিক বহু বিভিন্ন মতভেদ প্রচলিত আছে, যাহা প্রকৃত পক্ষে সমাজের প্রাণশক্তি বিনাশ করিতেছে, তজ্জন্যই আমার স্বদেশবাসীর দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে স্বদেশের উদার ধর্ম্ম-গ্রন্থের সহিত পরিচিত করাইতে আশা করিয়াছি। সরলভাবে প্রাণ মনের সহিত বিবেকের আজ্ঞায় এই পথ অবলম্বনে আমি আমার পরমাত্মীয় অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদিগের অনুযোগ, তিরস্কার, ও ভীষণ প্রতিকূলতাচরণ সহ্য করিতেছি, যাঁহাদের কুসংস্কার বদ্ধমূল, এবং যাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সকল ঐ কুসংস্কারপূর্ণ কুপ্রথার অস্তিত্বের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।" তাই তাঁহার ইংলণ্ড-যাত্রা উল্লেখে ইংরেজ-সমালোচক লিখিয়াছেন,—

"Nevertheless the hatred, scoffing and abuse to which he was subjected must have made him less sorry to leave India"

অর্থাৎ, "তথাপি, তাঁহার প্রতি ঘৃণা, বিদ্রূপ ও গ্লানিবর্ষণের জন্য তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগজনিত মনঃকষ্ট অবশ্য অল্পই অনুভব করিয়াছেন।"

ইদানীং বাঙ্গালাদেশে ও ভারতের স্থানে স্থানে ইংরেজি-শিক্ষিত কৃতবিদ্য-সমাজে বৎসরান্তে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সভা আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার সম্বন্ধে দুই এক ঘণ্টা আলোচনা করা হয়, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, সেই জীবনের আদর্শের সহিত এখনও আমাদের জাতীয় জীবনের এতই অনৈক্য যে, তাঁহার সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা শুধু বাক্যবিন্যাসের সহিত বলিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয় না। তাঁহার উপদেশ ও জীবন-চরিত্র আলোচনা দ্বারা আমাদের জাতীয়-জীবন গঠিত করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য। শুধু একেশ্বরে বিশ্বাস বা উপাসনা করিলেই সেই আদর্শ ফোটে না,—নবযুগের নব আদর্শ একাধারে জীবন, আত্মা, দেহ, মনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধন। এ যে নব্যভারতজাত এক নবীন আদর্শ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ দূর অতীতে এই ভারতবর্ষে তত্ত্বজ্ঞানের চূড়ান্ত আলোচনা হইয়াছে, মধ্যে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, পরে ক্রমে জীব-বাৎসল্য হইতে প্রেম ভক্তির অপূর্ব্ব আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই যুগযুগান্তরব্যাপী ধর্ম্ম-বিপ্লবের মধ্যে মানব-মনোরাজ্যে এক মহা উদ্দেশ্যময় ক্রম-বিকাশ রহস্য ক্রিয়া করিতেছিল। অবশেষে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সকলের মনোবুদ্ধির অগোচরে প্রতীচ্যের অভিনব কর্ম্মযোগ আসিয়া আমাদের দ্বারে অতিথি হইল। কিন্তু অতীত কাল হইতে আগত বিভিন্ন দেশীয় মানব-সমাজের এই সকল স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক ভাবের কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য বন্ধন ছিলনা, তাঁহারা সকলেই যে এক মহাতীর্থের সহযাত্রী, পৃথিবীর উপাসক সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ জীবনে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত না। সন্ধি-ক্ষণে নব্যভারতের জন্ম হইল। শুধু নব্যভারতের জন্ম হইল বলিলে যথার্থ বলা হয় না,—অভিনব ঊনবিংশশতাব্দীর আরম্ভে পৃথিবী তাহার পুরাকালীন জীর্ণবসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নববস্ত্র পরিধান করিল। প্রকৃতির সেই মহদভিপ্রায়ময় মুহূর্ত্তে একাকী রাজা রামমোহন

রায় পৃথিবীর পুরাতন ও নূতন উভয় মহাদেশের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। তিনিই উভয় মহাদেশকে পরস্পরের মনোরাজ্যের সহিত পরিচিত করিবার একমাত্র মধ্যস্থ। তিনি যে উদার আদর্শ ধরিলেন, তাহাতে উভয়ের মিলন হইল। যে অসাম্প্রদায়িক সমাজ তিনি প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সার্ব্বজনীনতা তাহার বিচিত্রতা। শুধু একেশ্বরে বিশ্বাস বা উপাসনাপরায়ণতা, অথবা পাশ্চাত্য আদর্শে "প্যাট্রিয়ট্" হওয়াই তাঁহার আদর্শ নহে। তাঁহার স্বদেশ-বাৎসল্যের মূলে ন্যায়নিষ্ঠা ও মানব-প্রেমের অনুপ্রাণনা। সর্ব্বাঙ্গীন দেশ-সংস্কার উপলক্ষেই তাঁহার আদর্শ ফুটিয়াছে, নতুবা উপাসনাপরায়ণতা ও আত্মত্যাগময় তন্ময় ধর্ম্মপ্রাণতা এ দেশে তো চিরকাল ছিল। সে বিষয়ে নূতন কথা বলিতে বা নূতন আদর্শ দেখাইতে আর কাহারও শক্তি সম্বল ছিল না। বরং স্বদেশের সেই প্রাচীন জ্ঞান-গৌরব প্রচার করিয়াই তিনি বিদেশে ভারতের সম্ভ্রম বাড়াইয়াছেন। তাঁহার বিরোধ ছিল, পরবর্ত্তী যুগের তথাকথিত হিন্দু সমাজের সহিত, যখন হিন্দু-সন্তানেরা কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক "সন্ন্যাস" গ্রহণ করিয়াছিল, যখন জনক যাজ্ঞ্যবল্ক্যের সরল উপাসনা, নানক চৈতন্যের সহজ নাম সাধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহারা ধর্ম্মের সহিত অশেষ তামসিক লৌকিকতা বিজড়িত করিয়াছিল

এই সকল দ্বিজবন্ধুদিগকে বুঝাইবার জন্যই বহু সহস্র বৎসর পূর্ব অতীতে ভগবদ্গীতার মহতী বাণী পবিত্র পাঞ্চজন্যে ধ্বনিত হইয়াছিল।

"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃকর্ম্মযোগঃ মশক্তঃ স বিশিষ্যতে।"

"যে আত্মাভিসন্ধিরহিত ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্মেই আমাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই বিশিষ্ট।"

স্বদেশের এই মহাবাণীকে সম্বল করিয়াই রামমোহন রায় দেশের দারুণ দুর্দ্দিনে বিধাতার বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মার জীবনব্যাপী আন্দোলন আলোচনার মধ্যে সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় যে, ঋষি সন্তানগণের মর্য্যাদা বিজাতীয় অনুকরণ ও চাক্‌চিক্যময় সভ্যতার প্রবল সংঘর্ষে বিলুপ্ত না হয়, সে জন্য তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতাকে তিনি তাঁহার স্বদেশে প্রাণপণে আহ্বান করিয়াছেন একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় রূপে, কিন্তু একমাত্র আদর্শরূপে নহে। তিনি ইউনিটেরিয়ান উপাসনালয় হইতে প্রত্যাগমন কালে অসাম্প্রদায়িক ব্রহ্মোপাসনা-মন্দিরকে অপূর্ব্ব জাতীয় পরিচ্ছদে সাজাইয়া পরস্পর বিবাদপরায়ণ ভারতবাসী জনসাধারণকে একত্রে সম্মিলিত করিবার কি মহান্ ভাবে উদ্বোধিত হইয়াছিলেন, তাহা সকলেরই জানা আছে। প্রত্যক্ষ আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বুদ্ধি, যাহা ভারতের জাতীয় জীবনকে সমূলে বিনাশ করিতেছিল, তাহার পরিবর্ত্তে অনন্তবিরোধী প্রার্থনা উপাসনার সমাজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা তিনি তাঁহার সেই মহতী আশা সফল হওয়া একান্ত সম্ভব মনে করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর যে এক ও অদ্বিতীয়, ইহা কোন্ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক বিশ্বাস না করে? সরলতার সহিত সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের নাম গান করার সহিত কাহার বিরোধ আছে? তাই তিনি আশা করিলেন যে, এই একমাত্র অবিরোধী ধর্ম্মজীবনের সাধনা দ্বারা ভারতবাসী সাম্প্রদায়িক ঘৃণা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া এক অপূর্ব্ব জাতীয় জীবন লাভ করিতে পারে। অথচ

এই জাতীয় জীবন তাঁহার ধর্ম্মজীবনের চরম বাঞ্ছিত নহে,—সে ধর্ম্মজীবনের চরম বাঞ্ছিত বিশ্বজীবন। আমাদের দেশটী তো তাহারি মধ্যে, সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করিলেও জীবন বিচ্ছিন্ন হয়। এই শ্রেণীর স্বদেশবাৎসল্য কখনই প্রাদেশিকতার অন্যায় সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ নহে।

এই অবিরোধী অসাম্প্রদায়িক ভাবটীকে সর্ব্বথা রক্ষা করিবার জন্যই সেই মহাত্মা সর্ব্বাস্তঃকরণে তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"সকল সম্প্রদায়ের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়। তাঁহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ আছে, এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে।

তবে তিনি যে নিজে ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষপাতী হইলেন কেন, আমরা সে কথার আলোচনা করিয়াছি। পুনরায় এ সম্বন্ধে তাঁহার স্বহস্তলিখিত একটী কথা উদ্ধৃত করিতেছি। মিঃ Froyerকে তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে লিখিয়াছিলেন,—

"All worship, whether of natural objects, images, persons, was directly or indirectly worship of the Supreme, but the direct worship is the most excellent, for while indirect worshippers quarrelled with each other's partial views of God, the direct worshipper had quarrel with none, for he adored the one God whom they also under howsoever differing forms actually adored."

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, যাহা সার্ব্বজনীন মিলনের অনুকূল ধর্ম্ম, তাহাই তাঁহার পরম বাঞ্ছনীয় ছিল।

আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যেও এইরূপ একটা অলীক ধারণা অদ্যাপি বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, রামমোহন রায় হিন্দু ধর্ম্মের একজন ঘোরতর শত্রু ছিলেন। যে মহাত্মা একমাত্র হিন্দুসমাজের কল্যাণের জন্য আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রতি স্বদেশবাসীর শত অপবাদ ও অপমাননা সত্ত্বেও আমরণ প্রকৃতপক্ষে তাহাদেরই শতকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, অশেষ গ্লানি ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও যে স্বজাতি-বৎসল মহাত্মার অন্তিম মুহূর্ত্তের বিখ্যাত প্রার্থনা এই যে, "বাহ্যিক রূপেও যেন তাঁহার হিন্দুত্বের কোন চিহ্ন হানি করা না হয়," তিনিই হিন্দু সমাজের শত্রুরূপে স্মরণীয় হইয়া আছেন, এই কথাটী যখনই ভাবা যায়, তখনই আমার মনে হয় যে, সেই মহাত্মার প্রকাশ্য বিরুদ্ধবাদীদিগের দ্বারা তিনি অসত্য বর্ণে চিত্রিত হইয়া পরবর্ত্তী হিন্দুসমাজের নিকট যতটা প্রচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, তদপেক্ষা তাঁহার অবিরোধী ধর্ম্মকে গ্রহণ পূর্ব্বক যাঁহারা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজ-মন্দিরেই স্বাতন্ত্র্য ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই তিনি হিন্দু জন-সাধারণের নিকট অধিকতর অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে, শত্রুতা তাঁহার হিন্দু সমাজের সহিত নহে—সকল সম্প্রদায়ের গোঁড়াদের সহিত। সাম্প্রদায়িক বিরোধের সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মনীতির চিরবিরোধ বিদ্যমান থাকিবে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় সুবিখ্যাত বিশপ-হিবার্ আগমন করিলেন। তাঁহার শুভাগমনের ৬ দিন পরেই St. Asaph এর Deanএর নিকট তিনি এইরূপ পত্র লিখিলেন,—"মহাশয়, হিন্দুস্থানে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি পক্ষে আর ভাবনা ছিল না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা শুধু ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ তার প্রাচীন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজের মনগড়া একটা সমাজ স্থাপনের

মতলব কবিয়াই আমাদেব পথে কণ্টক-স্বরূপ হইয়াছে।"

বলা বাহুল্য, বিশপ-কথিত এই "শুধু ঈশ্বব-বিশ্বাসী" ব্রাহ্মণটী যে কে, তাহা কাহাবও বুঝিতে বাকী নাই।

মহত্ত্বেব তুলনায় কোথায় বামমোহন রায়েব স্থান, তাব কোথায় এই সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-নেতাদেব স্থান। তিনি কিন্তু নির্ব্বিকাব চিত্তে কলিকাতাব প্রেস্‌বিটেবিয়ান্ খ্রীষ্টানদিগেব ভজনালযে বন্ধুভাবে উপস্থিত হইতেন, এবং সেই খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বিলাতে Church of Scotland এব কর্ত্তৃপক্ষেব নিকট ভাবতে সুযোগ্য প্রেস্‌বিটেবিযান্ মিশনবীগণকে পাঠাইবাব যৌক্তিকতা দেখাইয়া যে আবেদন পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে আনন্দেব সহিত তাঁহাব নাম স্বাক্ষব কবিযাছিলেন। সেই ঘটনাব সময়ে Dr. Bryce একজন প্রেস্‌বিটেবিযান্ খ্রীষ্টান, সেই আবেদন পত্রেব আবশ্যকতা ও গুরুত্বেব কথা বলিতে যাইযা বামমোহন বাযেব কথা লিখিয়াছিলেন,—

"To which this eminently gifted scholar, himself a Brahmin of high caste, had specially annexed his sanction" অর্থাৎ, সেই "অসাধাবণ শক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিত, যিনি নিজে একজন উচ্চশ্রেণীব-ব্রাহ্মণ, বিশেষরূপে এই পত্রে তাঁহার সম্মতিদান কবিযাছেন।"

এই ঘটনা তাঁহাব অবিবোধী ভাবেব আব একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আশ্চর্য্যেব বিষয, যে সময়ে তিনি তাঁহাব সমগ্র শক্তি সামর্থ্য দ্বাবা ট্রিনিটেবিযান খ্রীষ্টান সম্প্রদাযেব সহিত তর্কযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়েই আমবা দেখিতে পাই, তিনি তাঁহাদেব চার্চ্চে যাইয়া পরম কল্যাণাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের ন্যায়-পবিপূর্ণ সহানুভূতিব সহিত তাঁহাদেব আবেদন পত্রে আপন নাম স্বাক্ষর কবিযাছেন! এইখানেই তাঁহাব যথার্থ মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব। এক ভাবটীই অসাম্প্রদাযিকতাব লক্ষণ। অন্যেব অধিকার, এমন কি, অতিবিরুদ্ধবাদীব ন্যায়ানুগত অধিকাবেব প্রতিও সমদৃষ্টি ও সহানুভূতি!

ইহাতে তাঁহাব ধর্ম্মমতেব যেমন উচ্চতাব পবিচয় পাওয়া যায, তদপেক্ষা তাঁহাব প্রেমের পবিচয পাইয়া বিস্মিত হইতে হয। স্বজাতি-বিদেশী নির্ব্বিশেষে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে সেই বিচিত্র বাঙ্গালী-হৃদয পবিপূর্ণ ছিল বলিযাই তিনি তিব্বতেব নিষিদ্ধ নগবী মধ্যে বিদেশী বন্ধুদিগেব দ্বাবা সযত্নে বক্ষিত হইযাছিলেন, আদ্যন্ত প্রেমানুপ্রাণিত ছিলেন বলিয়াই অন্য সম্প্রদাযেব লোকদেব অকৃত্রিম ভালবাসা আকর্ষণে সমর্থ হইযাছিলেন। সুদূব ইংলণ্ডবাসী নবনাবী তাঁহাকে এমন তন্ময-তাব সহিত ভালবাসিত, যাহাতে কখনই এমন বোধ হয নাই যে, তাহাবা বামমোহন বায়কে মুহূর্ত্তেব জন্যেও বিদেশী বা বিধর্ম্মী মনে কবিত। যেন তিনি ইংলণ্ডেব আপন ঘবেব একজন ভক্তিভাজন মহাপুরুষ। এ কথা কাহিনী বা অতিবঞ্জন নহে, ঠিক এই ভাবেই সেই বঙ্গবাসী সেখানে গৃহীত হইযাছিলেন। বৃদ্ধ ব্রিটিশ দার্শনিকগণ ও ধর্ম্মপ্রাণ নবনাবী তাঁহাব সান্নিধ্যে পরম প্রীতি ও আনন্দ অনুভব কবিতেন, তাঁহাকে নিযত দেখিবাব আশায় ব্যাকুল হইয়া যাইতেন। ব্রিটিশ্ কন্যাগণ নিকটতম অস্তবঙ্গের ন্যায় পীড়িত বামমোহন রায়ের শুশ্রূষা কবিয়াছেন, ও তাঁহার অভাবে নিদারুণ শোকে কাতর হইয়াছেন। তাই

ব্রিটিশ্ সমালোচকের এই মহতী উক্তিকে আমরা অতি সত্য কথা বলিয়া বিশ্বাস করি যে, "It is no small testimony to his character that even a slight acquaintance with him was enough to stir stolid and phlegmatic Englishman to something very nearly a passion of love for him There must have been much love in the man to evoke such devotion"

"অর্থাৎ তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে ইহা একটী সামান্য প্রমাণ নয় যে, তাঁহার সহিত সামান্য একটু পরিচয় হওয়া মাত্র উপেক্ষা-শীতল ইংরেজ স্বভাব, যাহা কোন কালেই সহজে বশীভূত হইবার জিনিষ নয়, তাঁহাকে প্রায় উন্মত্তহৃদয়ে ভালবাসিত। এমন অপূর্ব্ব অনুরাগ আকর্ষণ করা, সেই মনুষ্যটীর প্রাণে অবশ্যই যে অগাধ প্রেম ছিল, শুধু তাহারই সাধ্যায়ত্ত!"

এই সুন্দর কথাটী সেই মহাত্মার হৃদয়ের এক নির্ম্মল, স্বাভাবিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। পরন্তু, মানবহৃদয়ের সরল সত্য প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

কাশীবাস।

"সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ।"

(চলিত বাক্য)

"বিন সদ্‌গুরু ভেদ ন পাবা।" (কণ্ডলেশ্বর বাবা)

"সদ্‌গুরু পাবে ভেদ বতাবে জ্ঞান করৈ উপদেশ।
কয়লাকী ময়লা ছুটে যব আগ করৈ পরবেশ।"

কবীর।

একবার মহাত্মা গঙ্গাবাবার দর্শন লাভ করিয়া জানকীনগর প্রান্তে আম্রকাননে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রদ্ধেয় বন্ধু (১) বলিয়াছিলেন, "ইঁহারা অন্ধকারময় সংসার-প্রান্তরে এক একটী আলোক।" এই সকল মহাপুরুষ সংসার ত্যাগ করিয়াও সংসারের কলরব মধ্যে আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন বলিয়া কত নীরস প্রাণ সরস হইতেছে, কত পাপী তাপী শান্তিলাভ করিতেছে, কত অবসন্ন হৃদয়ে নবোৎসাহের সঞ্চার হইতেছে। ইঁহাদের আশ্রমে যাইয়া কত শোকার্ত্ত শোক-অশ্রু মুছিয়া আসিতেছে, কত ব্যথায় কাতর নর-নারী বেদনা-ভার লঘু করিতেছে। লোকে কত অভাব অভিযোগ, কত হাহারব, কত দীর্ঘশ্বাস ইঁহাদের চরণে ঢালিয়া বিনিময়ে বিশ্বাস, সান্ত্বনা ও নির্ভর লইয়া গৃহে ফিরিতেছে।

আমাদের ন্যায় অবিশ্বাসীর নিকটেও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভিতর দিয়া যে সকল মহাপুরুষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে দুই একটী পরিচয়ের কথা লিখিত হইল।

কথিত আছে :—

মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেব দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

আমাদের ইচ্ছা হয়, এই সঙ্গে 'সাধু'র নাম যোগ করিয়া দিই।

১। লেঙ্গা বাবা। *

আট নয় বৎসর অতীত হইল (১৯০৩) আমরা গয়ায় লেংটা বাবার দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। তখন গয়ানগরে ব্রহ্মযোনি ও আকাশ-গঙ্গার মধ্যে অনুন্নত পাহাড়ের গায় উলঙ্গ সাধুর আশ্রম ছিল। গয়াবাসী কয়েক জন বিশিষ্ট ভক্তের যত্নে ও আগ্রহে আশ্রম

(১) বাবু বরদাপ্রসাদ রায় এম-এ, বি-এল।

* সম্প্রতি লেঙ্গাবাবার দেহান্ত হইয়াছে।

ইষ্টক গৃহে পরিণত হইয়াছিল। আশ্রম-সীমা মধ্যে ইষ্টক কপ পাথর ভেদ করিয়া ধ্বনিত হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর আদেশে আরো বহু স্থানে জীর্ণ শিবমন্দির সংস্কৃত হইতেছিল, এবং পুরাতন জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার হইতেছিল।

ভক্ত ও হিন্দু জনসাধারণের উপর সন্ন্যাসীর এরূপ প্রতিপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছিলাম যে, গয়ার কোন সরকারী কর্ম্মচারী তহবিল তছরূপের মকর্দ্দমায় পড়িয়া বিশেষ বিপন্ন হইয়াছিলেন। পরে কোন বন্ধুর উপদেশে উলঙ্গ সন্ন্যাসীর চরণে পড়িয়া অনেক কাতরতা জানাইলেন। সন্ন্যাসী 'দূর দূর' করিয়া তাড়াইয়া দিলেও তিনি আশ্রম ত্যাগ করিলেন না। অবশেষে দয়ার্দ্র হইয়া সাধু অভয় দান করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাঁহার কোন অনিষ্ট হইবে না। তিনি জজের নিকট হইতে খালাস হইয়া কর্ম্মে বহাল হইলেন। তদবধি তিনি কায়-মনোবাক্যে সন্ন্যাসীর আদেশ প্রতিপালন করিতেন এবং আশ্রমের জন্য অকাতরে বহু-অর্থ ব্যয় করিতেন। অতএব বিপন্নকে অভয় দান করিয়া কাতরের প্রতি করুণা দৃষ্টি করিয়া সাধুগণ আমাদিগের চিত্তাকর্ষণ করেন।

সন্ন্যাসীর এক চক্ষু অন্ধ, মস্তক ও মুখ-মণ্ডল কেশ-শূন্য, সুদীর্ঘ দেহ, হৃষ্ট পুষ্ট তনু। দেখিলে একজন বলিষ্ঠ পালোয়ান বলিয়া ভ্রম হয়। শরীর সম্পূর্ণ নগ্ন, পায়ে কাষ্ঠ পাদুকা। বাক্যালাপ শুনিলে পঞ্জাবী বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ অনুমান করিত, নেংটা সন্ন্যাসী পাতিয়ালার মহারাজার নিকট-আত্মীয়। গয়ায় যে সকল শিক্ষিত লোক ভ্রমণ করিতে যাইতেন, তাঁহাদের অনেকে একবার লেঙ্গাবাবার দর্শন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী দুই তিনজন সঙ্গিসহ সাধুর আশ্রমে যাইয়া অনেক সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রতি রবিবার অবসর দিনে গয়ানিবাসী বহুলোক সাধুর আশ্রমে যাইয়া উপদেশ শ্রবণ করিতেন। রাত্রি ৮।৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত আশ্রমে লোকের ভিড় থাকিত। গ্রীষ্মকালে অপরাহ্ণে গামলা গামলা বেলের সরবৎ সমাগতদিগের মধ্যে বিতরিত হইত। কখনও কখনও প্রচুর হালুয়া প্রসাদী পাইয়া ইন্দারার জলে লোকে পিপাসা নিবারণ করিত। নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধু দর্শনে গেলে রিক্ত হস্তে যাইতে নাই। ফল, ফুল, বা আর কিছু উপঢৌকন লইয়া যাইতে হয়। আমরা ছোট এলাইচ লইয়া যাইতাম। সে উপহার সাধু তৎক্ষণাৎ আমাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। অল্প কিছু নিজের সেবায় ব্যয় করিতেন। কোন কোন দিন তাঁহাকে হিন্দী যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পড়িতে দেখিয়াছি। সংস্কৃত পুস্তক কদাচিৎ কভু পড়িতে দেখিয়াছি কি না, স্মরণ নাই।

সন্ন্যাসী শঙ্করপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞানবাদী বৈদান্তিক সাধু ছিলেন। অতএব তিনি সুযোগ পাইলেই উপদেশ দিতেন, এ জগৎ মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চ। গৃহ, বৃক্ষ, আমি, তুমি, সে, এ সকল অলীক জ্ঞান—মায়ার খেলা মাত্র। এ সমস্তই ব্রহ্ম। জগতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমিই সেই ব্রহ্ম। মায়া মোহ কাটিয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে শুদ্ধবুদ্ধিতে নির্ম্মলজ্ঞানে মানুষ দেখিতে পায় এ বিশ্ব ব্রহ্মময়। ইহারই নাম আত্ম-দর্শন।

প্রথম দর্শন দিবসে পরমার্থজ্ঞান সম্বন্ধে উলঙ্গ সাধু আমাদিগকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

ভক্তির উদ্রেক হইলে লোকে সদ্‌গুরু

সমীপে যায়। গুরু তখন আত্ম-দর্শনের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন। গুরুর পঞ্চ লক্ষণ।—(১) তিনি ত্যাগী হইবেন, (২) জ্ঞানী হইবেন, (৩) নির্লোভ হইবেন, (৪) ব্রহ্মবেত্তা হইবেন, (৫) এবং ব্রহ্মচারী হইবেন,। অনেকে মন্ত্র দান করেন, 'হর-পার্ব্বতী', 'লক্ষ্মীনারায়ণ' প্রভৃতি ইষ্টদেব। এই মূর্ত্তি ধ্যান করিলেই জ্ঞান ও মুক্তি লাভ হইবে, আত্ম-দর্শন ঘটিবে। শিষ্য বুঝিয়া লয়, লক্ষ্মী বিষ্ণুর স্ত্রী, নারায়ণের চারি হস্ত। ক্রমে তাহার চিন্তা ও ধ্যান মূর্ত্তিতেই সীমাবদ্ধ হয়—উহারই ধ্যান, ধারণা ও অর্চ্চনা করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হয়। শিষ্য আরও মনে করে, হরপার্ব্বতী, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি দেবতাগণ যখন নানালীলা করিতেন, আমরা মানুষ তাঁহাদের ভক্ত হইয়া সে সকল করিলেই বা অপরাধ কি? গুরু শিষ্যকে ইষ্টমন্ত্র প্রদান কালে বুঝাইয়া দেন না, হরপার্ব্বতী ও লক্ষ্মী-নারায়ণ কি এবং তাহার প্রকৃতি কি প্রকার। যেমন পার্ব্বতী অপার অনন্তমায়াকে বুঝায়, লক্ষ্মীও সেই মহামায়া স্বরূপিণীকে বুঝায়। যাঁহাকে জানিবার কোন লক্ষণ নাই এবং যিনি লয় প্রাপ্ত না হইলে আত্ম-দর্শন দুর্লভ, তিনিই লক্ষ্মী। ইষ্ট দেবতার এই প্রকার স্বরূপ জানিয়া ধ্যান করা ও ইষ্টমন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। ইত্যাদি।

উপদেশান্তে কথা প্রসঙ্গে হরিহর-ছত্রের নাম উত্থাপিত হইলে সাধু বলিতে লাগিলেন:—

একবার পথ চলিতে চলিতে হরিহর-ছত্র দেখিয়াছি। অনতিদূর হইতে হাতী, ঘোড়া, উট, বহু লোকজন ও বাদ্যধ্বনিতে মনে হইল,বুঝি বরিয়াৎ (marriage procession) যাইতেছে। আরে! বাহিরের মেলা দেখিতে সকলে ব্যস্ত, কিন্তু ভিতরের খবর কেহ রাখেনা। এখানে যে এক অপূর্ব্ব মেলা বসিয়াছে,তাহাত একবার ভাই! দেখিয়া লও। তোমার ভিতরে মন বুদ্ধি পঞ্চেন্দ্রিয় যে কি এক মজার খেলা খেলিতেছে। যাহা খাইবার নয় ছুইবারও নয়, সেই মিথ্যা বস্তুর কেনা বেচা লইয়া মানুষ ব্যস্ত, আর যাহাতে প্রকৃত লাভ, সেদিকে কেহ দৃষ্টিপাত করে না। লোকে গঙ্গাস্নান করিতে নানা তীর্থে ঘুরিয়া মরে—এ তীর্থে নয়, ঐ তীর্থে গেলে অধিক পুণ্য হইবে ভাবিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করে। কিন্তু ভ্রান্ত-জীব দেখিতে পায় না, তাহার ভিতরেই সকল তীর্থ বিদ্যমান। এই স্থানে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী মহা তীর্থ।

কিছুক্ষণ অন্যকথা হইবার পর আমার সঙ্গী শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু (১) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামীজি। বর্ত্তমান সময় ভারতের ধর্ম্মভাব কি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতেছেন না, কম দেখিতেছেন?"

স্বামী—আমি যতদূর দেখিতেছি, তাহাতে গত ২০ বৎসরের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক—৫০ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তাহা অপেক্ষাও অধিক। বঙ্গ-দেশেও ধর্ম্মভাব এবং দানশক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। তবে অপাত্রে দান অতিশয় হয়। যেখানে পূর্ব্বে ধর্ম্মভাব অধিক ছিল, এখন সেখানে ন্যূন হইয়াছে, আবার যেখানে পূর্ব্বে কম ছিল, এখন হয়ত সেখানে বৃদ্ধি হইয়াছে, এরূপও দেখা যাইতেছে। মোটের উপর বৃদ্ধি বলা যাইতে পারে।

বন্ধুর একটী বালক পুত্র আমাদের সঙ্গে ছিল। সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রহ কোন্

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ, গয়া জিলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক।

হ্যায়!" উত্তরে বন্ধু বলিলেন, "মেরা লড়কা"। সন্ন্যাসী এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "সকলেই বলে, আমার ছেলে, আমার ছেলে, কিন্তু কে কাহার তাহা ভাবিয়া দেখে না। এই মায়ার ঘোরে সকলেই মুগ্ধ। আমার কেহই নাই, ইহা কেহ বুঝে না।"

বন্ধু—এই মায়ায়ই ত সংসার চলিতেছে, স্বামীজি। মায়া না থাকিলে যে সৃষ্টিলোপ হইত।

স্বামীজি—হাঁ, তা সত্য। এই জন্যই সাধুগণ বলিয়াছেন, মায়ার বশীভূতও হইবে না, মায়া নাশ করিয়া সমস্ত ত্যাগও করিবে না। সমভাবে অবস্থান করিবে। মায়াকে বশীভূত করিয়া মনকে অধীনে রাখিয়া সংসারে বিচরণ করিবে।

লেঙ্গাধারা আজও তেমনি করিয়া নগ্নদেহে কাষ্ঠপাদুকা পায় দিয়া পাহাড়ের গায় আশ্রমে বেড়াইতেছেন কিনা, বলিতে পারি না। যাঁহারা ফল্গুগর্ভে বালুকাপিণ্ড দান করিয়া পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিতে গয়া যাইবেন, তাঁহারা মঙ্গলাচণ্ডীর মন্দির ও গোদানক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া পার্ব্বত্য আশ্রমে উলঙ্গ সাধু দর্শন করিয়া নিজের আত্মার কল্যাণচেষ্টা করিতে গেলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীবসিকলাল রায়।

হিন্দু-সমাজ।

ব্যক্তি ও সমাজ।

সমাজকে উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তির গতি অসম্ভব। কারণ, সমাজ ব্যক্তিকে সাহায্য করে, আবার ব্যক্তিও সমাজকে সাহায্য করে। ব্যক্তির যেখানে বিকাশ নাই, সেখানে সমাজের উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির মিলনকে সার্থক ও চিরস্থায়ী করিবার জন্যই সমাজের সৃষ্টি। কিন্তু সমাজ ব্যক্তির নৈতিক স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে পারে না। সেই স্বাধীনতাকে স্ফুরিত করিতে হইলে সমাজের যত খানি ছাড়িয়া দিতে হইবে, ততখানি ছাড়িয়া না দিলেই সমাজ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইবে, একথা নিশ্চিত। আবার যেখানে ব্যক্তি নিজের অবনতি দিয়া সমাজের উন্নতি-পথ অবরুদ্ধ করে, সেখানে সমাজ তাহাকে শাসন করিবার জন্য নিয়ত উদ্যত থাকে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। এতএব দেখা যাইতেছে যে, উন্নতি অবনতি বিষয়ে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে গূঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত।

হিন্দু সমাজের উন্নতি ও শাস্ত্র।

আমাদের হিন্দু সমাজকে যাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া—অচল অবস্থায় রাখিতে চাহেন, তাঁহারা একটা কথা ভুলিয়া যান যে, মানুষের উন্নতিই যখন সমাজের লক্ষ্য, তখন তাহার সহিত যোগ রাখাই যে সমাজের ধর্ম্ম। উন্নতি কখনও অচল হইতে পারে না। এতএব ব্যক্তির উন্নতির সহিত সমাজকে যোগ রাখিতে গেলে, তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে, চলিতে হইবে। শাস্ত্র যদি সেখানে বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহা হইলে প্রকৃত উন্নতির দিকে চাহিয়া, তাহাকে উল্লঙ্ঘন করাই জীবন রক্ষার ধর্ম্ম! ব্যক্তিকে উন্নতি পথে চালনা করিতেই শাস্ত্রের প্রয়োজন। উন্নতি যখন

সচল, কখন শাস্ত্রকে অচল বলিয়া মান্য করা নিশ্চয়ই বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে।

উন্নতির প্রকার ভেদ।

তবে উন্নতির প্রকার ভেদে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমেই দেখিতে হইবে, উন্নতি যুগধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। যে যুগে যে প্রকার উন্নতি কামনা করে, সে যুগে সেই প্রকার উন্নতিই বাঞ্ছনীয় ও অনিবার্য্য, এবং সমাজও সেই পথে চলিতে বাধ্য। এই যুগধর্ম্মের ধারাকে সুস্পষ্টরূপে পাঠ না করিয়া কোন রকম উন্নতির পথে চলিবার প্রয়াস পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন-আশার মত বাতুলতা।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, হিন্দু জগতে আজ যে যুগধর্ম্ম উপস্থিত, সে কি প্রকার উন্নতি কামনা করে।

হিন্দুসমাজ ও বর্ত্তমান যুগ।

হিন্দুরা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চির-প্রসিদ্ধ। তাহাদের যত কিছু শাস্ত্র, সমাজ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, আচার নিয়ম, সমস্তই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিকাশের সহায়ক। সেই জন্য যুগে যুগে বিভিন্নরূপ ধরিলেও আদর্শের একত্বে সে গুলি এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কালে নানা কারণ বশতঃ হিন্দু নিজের উদ্দেশ্য ভুলিয়া কেবল অনুষ্ঠান লইয়া জীবন কাটাইতে আরম্ভ করে। তখন সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েই ধীরে ধীরে অচল হইয়া আসিতে থাকে। এই অবস্থার চরম-সীমায় যখন উপস্থিত, তখন পশ্চিম নূতন আদর্শ লইয়া হিন্দুকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। হিন্দু এখন কি করিবে? প্রাণহীন অনুষ্ঠান লইয়া থাকিবে, না, নূতনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইয়া যাইবে! এই সমস্যা সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কিন্তু যে সমাজ দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, তাহা একেবারে বিধ্বস্ত হইতে পারে না। হিন্দু তাই নূতনের মধ্যে একেবারে নিমজ্জিত হইল না। তবে তাহার অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটিল বটে। ব্যাঘাত ঘটিল বলিয়াই হিন্দু জাগ্রত হইল, এবং দেখিল, পশ্চিমের এই আদর্শকে অবজ্ঞা করিয়া চলা তাহার পক্ষে নানা কারণে এখন অসাধ্য। এই আদর্শকে কেমন করিয়া সে নিজের করিবে, ইহাই তাহার পরবর্ত্তী সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। সেইসমস্যা পূরণের পথেই যত বিরোধ বাধিতেছে।

হিন্দুর কর্ত্তব্য।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, যথার্থত হিন্দুর হৃদয়ের বাণী—আধ্যাত্মিক উন্নতি।

যে হিন্দু এই বাণী না শুনিয়া কেবল মাত্র অনুষ্ঠানের খোসাকে ঠিক রাখিতে চায়—সে অহিন্দু। পশ্চিমের আদর্শকে ঘৃণা করে, করুক, তাহার কথায় কোন সম্মোহন-শক্তি থাকিতেই পারে না। আবার যে হিন্দু আপনার হিন্দুত্বের ছাপ দিয়া পশ্চিমের আদর্শকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তাহাকেও কদাচ হিন্দু বলিব না। এখন প্রকৃত হিন্দু সে-ই হইবে, যে পশ্চিমের আদর্শ-অনুসারে পূর্ব্বকৃত আচার নিয়ম প্রভৃতি যথা-সম্ভব পরিবর্ত্তিত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে চলিতে যত্ন করে।

বহির্জগত ও হিন্দু।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, পশ্চিমের আদর্শে আমাদিগকে বহির্জগতের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইলে, আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব। তাহা হইলে আমি প্রশ্ন করিব, হিন্দু কি কোন কালে জাগতিক উন্নতি করে নাই?

আমার বোধ হয়, এ প্রশ্নের কেহই নেতিবাচক উত্তর দিবেন না।

হিন্দুর সমাজে কৃষি বাণিজ্য যুদ্ধ বিগ্রহ সমস্তই চলিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদিগের আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটে নাই। সংযম, স্বার্থত্যাগ ও সুদৃঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাসের দ্বারা তাহাদের সমস্ত ধর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হইত—সেই জন্য বহির্জগত আহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে নাই। হিন্দু এখন তাহার আদর্শ হারাইয়াছে বলিয়াই বাহিরকে এত ভয় করে। সে ভুলিয়াছে, আপনার আদর্শকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিলে বেষ্টনীকে নিজের অনুকূল করিয়া লইতে হয়। এখন হিন্দুর প্রাণ আদর্শের প্রতি নাই, তাই বেষ্টনীকে অনুকুল করিবার শক্তিও লুপ্ত হইয়াছে।

তবে একথাও বলি, জোর করিয়া কিছুই হয় না। কালে আপনার সনাতন আদর্শের প্রতি হিন্দুর অনুরাগ ফিরিবেই। ধীরে ধীরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নবসংঘাত-জনিত বিপ্লব থামিয়া যাইবে, এবং অজ্ঞাতসারে হিন্দু আপনার আদর্শ লাভ করিবার জন্য নূতন প্রণালী অবলম্বন করিবেই।

অনুষ্ঠানের মায়া।

বহুদিন ধরিয়া হিন্দু যে অনুষ্ঠানগুলি যন্ত্রচালিতবৎ পালন করিয়া আসিতেছে, তাহাদের উপর তাহার মায়া হওয়া স্বাভাবিক। সেই অনুষ্ঠান গুলির উপর আঘাত পড়িতেই সে ক্রন্দন করিয়া উঠিল, এবং লোকের কাছে শাস্ত্র খুলিয়া দেখাইল, তাহার অনুষ্ঠান কত আবশ্যক। কিন্তু অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য। সে আদর্শ যখন সম্মুখে নাই, তখন অনুষ্ঠান যে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে, সে কথা তাহার মনে হইল না। তাই তাহার ক্রন্দন—দুর্ব্বলের ক্রন্দন, এবং সেই জন্যই হাস্যকর।

হিন্দু পুরাতন ও নূতন উচ্ছৃঙ্খল দল।

এই ক্রন্দনশীল হিন্দুকে যেমন কৃপার পাত্র মনে করা যায়, তেমন আবার পাশ্চাত্যশিক্ষা-গর্ব্বিত সংযমহীন হিন্দুকেও আমরা ঘৃণার পাত্র মনে করি। হিন্দুর যে কিছু বিধি নিয়মকে যাঁহারা পদদলিত করিতে চাহেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজের বাহিরে থাকুন, ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ। ত্যাগশীলতার জ্যোতি দেখিয়া যাঁহারা ভীত হন, সংযমের পবিত্রতাকে যাঁহারা তুচ্ছ করেন, সমস্ত প্রাণ মন কর্ম্মের ফলাফলকে ভগবানে অর্পণ করা যাঁহারা বাতুলতা মনে করেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের কেহ নহেন। সংস্কারকের পদে তাঁহারা আরূঢ় হইলেই আমরা ভীত হইয়া পড়ি।

আশার কথা।

কিন্তু এমন ধ্বংস ও সংগঠন-যুগ চলিতেছে। এখন যাহা ঘটিতেছে, তাহা স্বাভাবিক, তাহা আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু হিন্দু যে আপনার আদর্শকে অচিরেই ফিরিয়া পাইবে, তাহার সূচনা দেখা দিতেছে। সেই আদর্শের অনুকূলে পাশ্চাত্য আদর্শকে সে আনিবেই আনিবে। নবপ্রণীত অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে কত রকম ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়া যে হিন্দু সমাজকে আরও চলিতে হইবে, তাহা আর ভাবিয়া স্থির করিবার যো নাই। কিন্তু সে চলিবে—বসিয়া থাকিবে না। পুরাতন দলের হাজার ক্রন্দন কিম্বা উচ্ছৃঙ্খল নূতন দলের হাজার প্রয়াসেও তাহাকে রুদ্ধ রাখিতে পারিবে না।

নূতন আদর্শের ভাবসম্পদকে নিজের মধ্যে সমন্বয় করিয়া হিন্দু আপনার আদর্শকে নূতন করিয়া লাভ করিবে।

হিন্দু সমাজ এতদিন মরিয়াছিল—কিন্তু আবার তাহার নূতন করিয়া জন্ম লইবার দিন সন্নিকট। সেই মঙ্গলময় দ্বিজত্বের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই এখন হতাশ হওয়া নিষ্প্রয়োজন। শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

মহাত্মা এলান হিউম।

"As rain when all is parched and dry
Relieves the thirsty ground,
So the sweet voice of sympathy,
To the sad heart is found"
"Ah! Sweeter than the sweetest flower
At evening's dewy close,
The will united with the power
To succour human woes"

সুরেন্দ্রনাথ, মনোমোহন, উমেশচন্দ্র, আনন্দমোহন, অযোধ্যানাথ, গোখলে, দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। এ তাঁহাদের দেশ। হিতাহিত, মঙ্গলামঙ্গল, শুভাশুভ দেশের তাঁহারা ভোগ করিবেন। তাঁহাদের পুত্র পৌত্র ফলভোগী হইবেন, তাঁহাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু যাঁহারা এ দেশের কেহ নহেন, যাঁহারা পথের পথিক (bird of passage), যাঁহারা কিছুদিন এদেশে থাকিয়া এদেশ হইতে চলিয়া যাইবেন, তাঁহারা যদি এ দেশকে ভালবাসেন, তাঁহারা মহাপুরুষ। আর যদি এ দেশের সন্তানগণ অপেক্ষাও অকাতরে ইহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহারা দেবতা। দেশের দেশানুরাগী ব্যক্তিগণ স্বদেশের ভ্রাতৃগণের নিকট সমাদৃত হইবেন, বিপদে আপদে সহানুভূতি পাইবেন। এমন কি, তাঁহাদের জন্য লোকে প্রাণ উৎসর্গ করিতেও কাতর হইবে না। কিন্তু যে জাতির মধ্যে ইঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং লালিত পালিত হইয়াছেন, সেই ভ্রাতৃগণ বন্ধুগণের উপহাস মস্তকে ধারণ করিয়া, এমন কি, তাঁহাদের কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়াও যাঁহারা বিশ্ব-হিতৈষণাতে দীক্ষিত হয়েন, কেবল 'মনুষ্যভ্রাতা' এই বলিয়া দেশ, কাল, অবস্থা অবহেলা করিয়া তাহাদের সকলের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাঁহারা মানবগণ মধ্যে ধন্য। জগতে বিশ্বহিতৈষী লাওয়ার্ড, বুদ্ধ, চৈতন্য আপন পর ভুলিয়া গিয়া জগতের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজ উনবিংশ ও বর্ত্তমান শতাব্দীতে মহাত্মা হিউম্ বিজাতি জাতির অঙ্গীভূত হইয়াও ভারতের উন্নতির জন্য, ভারতের দুঃখ অপনোদনের জন্য জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন।

তিনি দেখিলেন, ভারতবাসী পাশববলহীনতার জন্য জ্ঞান, ধর্ম্ম, দয়া, সৌজন্য, স্নেহ মমতা প্রভৃতি নানাগুণে বিভূষিতা হইয়াও হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সাগর-সৈকতের বালুকারাশির ন্যায়, সামান্য প্রবল প্রভঞ্জনেই উহারা আকাশমার্গে উড্ডীন হয়। সামান্য

দুর্ভিক্ষে শত শত লোক কালগ্রাসে নিপতিত হয়। অথচ এদেশ শক্তির আধার, অথচ এদেশ কুবেরের ভাণ্ডার। তাই এই মহাত্মার বিশ্বহিতৈষী প্রাণ ভারতের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। রণক্ষেত্রে ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত সৈনিক পিপাসার্ত্ত সিপাহীর নিকট জল চাহিলেন। সিপাহী উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইয়াও তাহার নিকট ম্লেচ্ছধর্ম্মী সেনাপতিকে লোটা প্রদান করিলেন, যখন সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তোমার লোটা অপবিত্র করিলে? সদয়-হৃদয় সিপাহী বলিল, আপনি ত আমার বেবাদার। এই সহানুভূতিপূর্ণ কথায় কেবলমাত্র সেই সিপাহীকে নহে, যেদেশে ও যে জাতিতে সেই সিপাহী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই জাতিকে ও সেই দেশকে একেবারে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। প্রেমের ধর্ম্ম অতি নিগূঢ়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যে বার বঙ্গদেশকেও ভারতকে কাঁদাইয়া কেশবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলেন, সেইবার খ্রীষ্টমাসের সময় মিষ্টার হিউম সম্পাদক হইয়া, ডব্লিউ সিঃ ব্যানার্জ্জী সভাপতি হইয়া, দেশানুরাগী নরেন্দ্রনাথ সেন, মনোমোহন ঘোষ, দাদাভাই নওরোজী প্রভৃতি মহাত্মাগণ দেশের এই মহাশক্তি কংগ্রেস (জাতীয় মহাসমিতি) সংস্থাপন করিলেন। এবং মহাত্মা হিউম এই সম্পাদকত্ব স্বদেশে এবং বিদেশে, আলোকে এবং আঁধারে, রোগে এবং সুস্থতায় কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, এবং স্নেহময়ী মাতার ন্যায় চিরদিন ইহাকে প্রাণোদ্ভূত স্তন্যধারায় পালন করিয়াছেন। কংগ্রেসের বিপদ দেখিলে অথবা কংগ্রেসসেবীদিগের প্রাণে কোন বিভীষিকা উপস্থিত হইলে, একখানি সুলিখিত সুন্দর পুস্তিকা লিখিয়া তাঁহাদের প্রাণে আশা ভরসা প্রদান করিতেন। দেশের সুদিনে এবং দুর্দ্দিনে সকল সময়ে হিউমের মাতৃহৃদয় ভারতের জন্য কাঁদিয়া উঠিত। শরীরে একটু সামর্থ্য থাকিতে তিনি এই প্রাণোপম জাতীয় মহাসমিতিতে উপস্থিত হইতে অবহেলা করেন নাই। এতদ্ভিন্ন পুণ্যভূমি ইংলণ্ডে থাকিয়া, ইণ্ডিয়া আপিসের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভারতের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য নানা উপায় করিয়াছেন। সর্ব্বদাই কংগ্রেসসেবীগণকে বিপ্লবের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন, এবং ইংরাজী-শিক্ষিত উন্নতিশীল সম্প্রদায় যে দেশের মঙ্গলসাধনের জন্য বিশেষভাবে আহূত, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই উৎসাহ আমাদের প্রাণে যেন স্বর্গীয় আশ্বাসবাণীর ন্যায় বোধ হইত। সর্ব্বদাই কংগ্রেসসেবীগণ মনে করিতেন, হিউম যেন তাঁহাদের মাতা। বিপদ আপদ সময় তাঁহার স্নেহ অথবা তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে রক্ষা করিবে। কয়েকবৎসর কংগ্রেসমণ্ডপে ঝটিকা উত্থিত হইয়াছে, মহাত্মা হিউমের প্রাণ কাঁদিয়াছে এবং তখনই তাঁহার আশার বাণী শ্রুত হইয়াছে। কয়েক বৎসর ভারতবর্ষ রাজনৈতিক অনলে দগ্ধ হইতেছিল, হিউমের প্রাণের আশীর্ব্বাদ যেন এই অশান্তির মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়াছে। আমরা বিপদে আপদে, সুখে দুঃখে সদাই ভাবিতাম, একজন আমাদের আছেন, যিনি আমাদের উপকারের জন্য সমস্ত শক্তি সমর্পণ করিবেন। হায়! আজ জাতীয় মহা-সমিতি অনাথ হইল! আজ ভারতবাসী একজন প্রাণের বন্ধু হারাইল! ভারতবাসীর প্রাণ এই মহান্ হিতৈষীর জন্য কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু কোন দিন ভারত তাঁহার মৃত দেহে জীবন-সঞ্চারী এই মহাশক্তিকে ভুলিবে না।

যাও মহাত্মা হিউম। সেই অনন্ত ধামে,

যেখানে স্বার্থপর লোকের বিদ্বেষ সাধু-চরিত্র মানবগণকে ব্যথিত করিতে পারে না, যেখানে ন্যায়পরায়ণতা কোন বাধা প্রাপ্ত হয় না, যেখানে মানবহিতৈষণার প্রকৃত পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পৃথিবীতে আমাদের দুঃখ-নিকেতন। কার্য্যক্ষেত্র কিন্তু সেই দেশ, যেখানে পুণ্য পবিত্রতা এবং ধর্ম্মের সমাদর আছে। তথায়ই তোমার ন্যায় মহাত্মাগণের আদর হইবে। ভারতবাসী চিরকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিবে।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

মানবের ভ্রাতৃভাব।

সকলেই বলেন, মনুষ্য পরস্পর ভাই। কিন্তু ভাই বলিলেই মাতা পিতা বুঝায়। ভাই থাকিলেই অবশ্য মাতা পিতা আছেন। ভ্রাতৃত্বের মূলে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব। মানবের মাতা পিতা পরমেশ্বর। তিনি একাধারে মাতা পিতা। কিন্তু নিরীশ্বরবাদী মানুষকে কেমন করিয়া ভাই বলিবে? তাহার মাতা পিতা কোথায়? যাহার মাতা পিতা নাই, তাহার ভাই কেমন করিয়া সম্ভব? নাস্তিক কাহাকেও ভাই বলিতে পারে না। যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক, সকলেই মানুষকে ভাই বলিতে পারে, কেবল নিরীশ্বরবাদী পারে না। নিরীশ্বরবাদী যে মানুষকে ভাই বলে না, এমন নহে, কিন্তু তাঁহাদের বলা যুক্তিযুক্ত নহে।

মানুষ, মানুষকে ভাই বলে বটে, কিন্তু কার্য্যে ভাই করিতে কজন পারে? মুখে ভাই বলা সহজ, কিন্তু কাজে ভাই করিতে পারা নিতান্ত কঠিন। মুখে ভাই বলা, আর জীবনে ভাই করা, এ দুই অনেক ভিন্ন। যাহারা এক আপিসে কাজ করে, তাহারা পরস্পরকে ভাই কর্ম্মচারী (brother officer) বলে। তাহারও অর্থ স্বতন্ত্র। কোন একটা বিষয় এক সঙ্গে করিলেই পরস্পর ভাই হয়। কিন্তু ভাই শব্দের অর্থ তাহা নহে। প্রকৃত অর্থ এক মাতা পিতার সন্তান। যখন ঈশ্বর-বিশ্বাসী কোন মানুষকে ভাই বলেন, তখন সেই প্রকৃত অর্থেই বলেন।

প্রকৃত ঈশ্ববিশ্বাসী মানুষকে ভাই বলেন, এবং মানুষের প্রতি ভায়ের মত ব্যবহার করেন। কিন্তু জগতের লোক সকলেই কি তাই করে? মুখে ভাই বলিতে পারে, কিন্তু কাজে কয়টা লোক সেরূপ ব্যবহার করে? জগতে কত ধর্ম্ম সম্প্রদায়। সকল সম্প্রদায়ের লোকই বলিতেছে, মানুষ ভাই। কিন্তু কাজ করে, এমন কয়জন? বরং এমন নাস্তিক আছে, যাহারা মানুষের সঙ্গে ভায়ের মত ব্যবহার করে, কিন্তু অনেক লোক আপনাকে ঈশ্বরবিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াও মানুষের প্রতি ভায়ের মত ব্যবহার করে না। ভাই বলিলেইতো হয় না, কার্য্যে ভায়ের মত ব্যবহার করা চাই। যে দিন জগতে কেবল ভাই বলা থাকিবে না, ভায়ের মত কাজ হইবে, সেই দিনই সংসার স্বর্গ হইবে।

এখন সংসারের অবস্থা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। মানুষের প্রতি মানুষের কি ভয়ানক অত্যাচার। মানুষ, মানুষের যে সর্ব্ব-

নাশ করিতে পারে, কোন হিংস্রজন্তুও এত পারে না। ব্যাঘ্র, ভল্লুককে মানুষ ভয় করে; কিন্তু ইহা কি সত্য নয় যে, এমন মানুষ আছে, যাহারা তদপেক্ষা অনেক গুণে ভয় করিবার বিষয়। অনেক মানুষ আছে, তাহারা ব্যাঘ্র, ভল্লুক অপেক্ষাও ভয়াবহ।

মানুষ কি করিতে না পারে? মানুষ, একদিকে যেমন দেবতা, সেইরূপ আর দিকে জন্তুর অধম। মানুষকে জন্তু বলিলে, নির্দ্দোষ জন্তুদিগকে অপমান করা হয়। জন্তুরা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে; কিন্তু মানুষ আপনার ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া কি জঘন্য করিয়াই ফেলে। মানুষ একদিকে যেমন স্বর্গের দেবতা, আর একদিকে সেইরূপ সয়তানের সহচর। এসকল কথা অত্যুক্তি নহে।

জগতে ধর্ম্মের জন্য কত অধর্ম্ম। অধর্ম্মতো জগতে অনেক আছে, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য অধর্ম্ম, এ বড় ভয়ানক। অধর্ম্ম ধর্ম্মের বেশে আসে, ইহার তুল্য ভয়ানক আর কি আছে? বরং স্পষ্ট অধর্ম্ম ভাল, তথাচ ধর্ম্মের ছদ্মবেশে যে অধর্ম্ম আসে, তাহা অতি ভয়াবহ।

মানবের ভ্রাতৃভাবের বিষয় বলিতে গেলে অনেক কথা মনে হয়। জগতে প্রকৃত ভ্রাতৃভাব নাই বলিলেই হয়। সাংসারিক লোকের মধ্যে তো নিশ্চয়ই নাই। যাঁহারা ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করেন, কোন ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যেও প্রকৃত ভ্রাতৃভাব দেখিতে পাই না। ঈশ্বরকে মাতা পিতা বলিয়া প্রকৃতরূপে যাঁহারা ভক্তি করেন, তাঁহাদেরই প্রকৃত ভ্রাতৃভাব সম্ভব। কিন্তু সেরূপ লোক কয়জন আছেন? আন্তরিক ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরকে মাতা পিতা বলিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস সংসারে দুর্লভ।

যেখানে যথার্থ ঈশ্বর-ভক্তি, সেখানে মানবের প্রতি প্রকৃত ভ্রাতৃভাব হইবে। এই যে দুটী ভাব, এই দুইটী পরস্পরকে সাহায্য করে। যত পিতৃভাবের উন্নতি, ততই ভ্রাতৃভাবের উন্নতি। ঈশ্বরকে ভক্তি করিলে, মানবের প্রতি নির্ম্মল প্রেম বৃদ্ধি হয়, আবার মানবের প্রতি প্রেম ঈশ্বরভক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেয়।

জগতে অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনার দলের লোককে ভালবাসে। কিন্তু ইহাই দুঃখের বিষয় যে, মানুষ প্রায়ই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোককে ভাল চক্ষে দেখিতে পারে না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জগতের অনেক অনিষ্ট করিয়াছে। ইতিহাস এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। প্রেম প্রচারের পরিবর্ত্তে জগতের ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে লোকে অধর্ম্ম করিয়াছে। লোকে ধর্ম্ম মনে করিয়া কত মহাপাপ করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাপ যে নরহত্যা, ধর্ম্মের নামে তাহাও হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশতঃ শত শত নরহত্যা ঘটিয়াছে। ইহার সাক্ষী ইতিহাস।

ধর্ম্মের যে দুটী মূল সত্য, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব, এই দুটী সত্য যদি মানুষ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সংসারের অশেষ উন্নতি হয়।

মানুষ যত ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই মানুষেরও নিকটবর্ত্তী হয়। যত ঈশ্বরকে চিনিতে পারে, তত মানুষকেও চিনিতে পারে। এ দুই পরস্পর সাপেক্ষ। এমন এক প্রকার ধর্ম্ম আছে, যাহাতে ঈশ্বর ভক্তির কথা আছে, কিন্তু মনুষ্য-প্রেমের কথা নাই। ইহার কারণ এই যে, সেই মতাবলম্বী লোকেরা যদিও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, কিন্তু

সংসারকে মায়া বলেন। সকলই মায়া, সকলই মিথ্যা। সকলই যখন মিথ্যা, তখন তাহার প্রতি প্রেম হইবে কেন? এই মায়াবাদ নিশ্চয়ই মিথ্যা। জগৎ যদি মিথ্যা, তবে যিনি মায়াবাদ সমর্থন করিতেছেন, তিনিও মিথ্যা। এ মতের কোন মূল নাই।

মানবের ভ্রাতৃভাব হইতে কয়েকটী তত্ত্ব সিদ্ধান্ত হইতেছে। প্রথম, ভ্রাতৃভাব হইতেই পিতৃভাব। ভ্রাতৃভাব যেখানে, সেখানে একজন পিতাকে স্বীকার করিতেই হইবে। দ্বিতীয়, মানবকে ভাই বলিলে তাহার সহিত একটী স্থায়ী সম্বন্ধ অনুভূত হয়। সেই স্থায়ী সম্বন্ধজনিত কতকগুলি ক্রিয়া আছে। সে ক্রিয়াগুলি কি? প্রথম, কেবল মুখে ভাই বলা নয়, ভাই বলিয়া ভালবাসা। মনুষ্য মাত্রেই ভালবাসার পাত্র। মানুষ যখন ভাই, তখন অবশ্য ভ্রাতৃপ্রেমের পাত্র। ভ্রাতৃপ্রেমের পাত্র হইলেই ভ্রাতৃসেবার পাত্র। প্রেম তো কেবল কথায় হয় না। প্রেম বলিলে সেবা বুঝায়। অতএব মানুষকে ভাই বলিলেই তাহার সেবা করিতে হইবে।

জগতের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতৃসেবা কোথায়? যদি মানুষ যথার্থই পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই মনুষ্যকে ভাই বলিয়া ভালবাসিত। মূলে পিতাতেই বিশ্বাস নাই, তবে ভ্রাতৃপ্রেম কোথা হইতে আসিবে? কোন কোন নাস্তিক মানুষের প্রতি ভাল ব্যবহার করে, কিন্তু অনেক লোক আপনাকে ঈশ্বরবাদী বলিয়াই মনুষ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হন না।

মৌখিক প্রেমের কোন মূল্য নাই। যদি প্রেম না থাকে, কর্ত্তব্য জ্ঞানেও কাজ কর। পরমেশ্বরের কাজ করিতেই হইবেই। যাহার যেরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থা, তিনি সেই ভাবে কাজ করিবেন। যিনি প্রেমিক, তিনি প্রেমে কাজ করেন। যিনি ততদূর উঠিতে পারেন নাই, তাঁহাকে কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য করিতে হইবে। ভ্রাতার প্রতি যদি প্রেম না থাকে, কর্ত্তব্য জ্ঞানে তাহার সেবা কর।

পরমেশ্বর যখন আমাদের সেবা করিতেছেন, তখন আমরা তাহার সন্তানের সেবা করিতে বাধ্য। এই বাধ্যতাবোধ অন্তরে স্পষ্ট অনুভব করা যায়। ইহা যে ঈশ্বরের বাণী, ইহা নিশ্চিত সত্য। পরোপকার কর, এই বাক্য সর্ব্বদা বিবেক বলিতেছে। ইহা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের বাণী। অন্য কোন প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা হয় না। ব্যাখ্যা করিতে গেলেই স্বার্থপরতা দ্বারাই ব্যাখ্যা হয়। তাহা হইলে পরোপকার হইল কই? আত্ম উপকারই হইল। অন্যের উপকার করিব কেন? এই জন্য যে, সকলে যদি সকলের উপকার করে, তাহা হইলে জনসমাজের উপকার হয়। আর, আমি সেই জনসমাজের একজন। সুতরাং আমারও উপকার হয়। ইহা তো পরোপকার হইল না, আত্মোপকার হইল। সুতরাং বলিতে হইবে যে, পরোপকার অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না। উহা একটী মৌলিক প্রবৃত্তি।

জীবের উপকারের ইচ্ছা, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ইহা দর্শন শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ইহা তাহার স্থান নহে। পরোপকার প্রবৃত্তি যে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? এ বিষয়ে সূক্ষ্ম তর্কের প্রয়োজন নাই। ইহা মানব হৃদয়ে ঈশ্বর-সৃষ্ট স্বাভাবিক বৃত্তি। এতএব বলা যাইতে পারে যে, ইহা একটী পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ। তাঁহার সন্তান

বলিয়া যথাসাধ্য জীবের হিত সাধন করা কর্ত্তব্য। প্রেমে হউক, কর্ত্তব্যজ্ঞানে হউক, সর্ব্বদা মানবের মঙ্গল সাধন করিবে। নতুবা জীবের একটী মহা কর্ত্তব্য বিষয়ে অবহেলা করা হইবে। পরমেশ্বরের আদেশ উল্লঙ্ঘন করা হইবে। সকলেই সকল কাজ করিতে পারে না। যাঁহার যেমন ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ করিবেন।

কোন কোন নীতিজ্ঞের মত এই যে, ধর্ম্মমাত্রই পরোপকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ মত সত্য বলিয়া মনে করি না। ন্যায়, পবিত্রতা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, দয়া, এ সকল মানব হৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি। কেবল এক দয়া বৃত্তির দ্বারায় সকল মনোবৃত্তির ব্যাখ্যা করা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাহা হইলেও দয়া যে একটী প্রধান ধর্ম্ম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। প্রাচীন কাল হইতে, আমাদের দেশের একটী কথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, "নোপকারাৎ পরোধর্ম্ম।" উপকারের অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। অতি সত্য কথা। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে চারিটী মূল সত্য আছে, তন্মধ্যে শেষটী এই, "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্যপ্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য কি? ন্যায়পরতা, সত্যপরায়ণতা, পবিত্রতা, এ সকল অবশ্য তাঁহার প্রিয়। কিন্তু পরোপকার কি তাঁহার বিশেষ প্রিয় নয়? তিনি প্রেমস্বরূপ। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি ভালবাসেন। ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকল জীব তাহার সন্তান। তিনি সর্ব্বদা সকলের সেবা করিতেছেন। আমরা তাহার কি সেবা করিতে পারি? তাঁহার সেবা করিবার বা কি আছে? তিনি পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর পূর্ণানন্দ পুরুষ। তাঁহার কি অভাব, কি দুঃখ আছে? সুতরাং তাঁহার সেবা আমরা কি করিব? তাঁহার সেবার যদি কোন অর্থ থাকে, তাহা এই যে, তাঁহার সন্তানদের সেবা।

মানুষ মানুষের উপকার করিবে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। প্রেমময়ের ইচ্ছা যে, আমরা তাঁহার প্রিয় সন্তানদের সেবা করি। ইহা *অতি প্রধান ধর্ম্ম। কতকগুলি অর্থ-শূন্য বাহ্য* ক্রিয়াকলাপে শক্তি, সময়, ও অর্থ বৃথা নষ্ট না করিয়া জীবের হিতসাধনে যত্ন করা কি লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ কার্য্য নহে?

ধর্ম্ম কি? পরমেশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করাই ধর্ম্ম। কিন্তু কি তাঁহার ইচ্ছা এবং কি তাঁহার ইচ্ছা নহে, ইহা কেমন করিয়া বুঝিব? জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান কি? জ্ঞান দুই প্রকার। এক প্রকার জ্ঞান সহজ, স্বতঃসিদ্ধ। আর এক প্রকার জ্ঞান যত্নে উপার্জ্জিত। ধর্ম্মের যে সকল মূল সত্য, তাহা নিশ্চয়ই সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ। সত্যপরায়ণ হও, পবিত্র হও, ন্যায়পরায়ণ হও, পরমেশ্বরকে ও গুরুজনকে ভক্তি কর। এ সকল নিশ্চয়ই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম।

সেইরূপ, পরোপকার। অন্যের হিত-সাধন কর। ইহা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক, মৌলিক, স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। তার্কিকেরা এ কথা লইয়া কতই তর্ক করেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, ও সকল বৃথা বাগ্‌জাল মাত্র। বাক্যের ছটা, আর সহজ সত্য, এক পদার্থ নহে। অনেক ব্যক্তির এমন বাগ্মীতা আছে যে, সত্যকে মিথ্যা, এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ

করিতে পারেন। অন্ততঃ আপাতত, যেন সেইরূপ বোধ হয়। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি সত্য মিথ্যা হইবে? এবং মিথ্যা সত্য হইবে? ইহা কি একটা ভোজবাজির খেলা যে, হয়কে নয় করিব, এবং নয়কে হয় করিব? সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের রাজ্যে ইহা কখনই সম্ভব নহে। সত্য যাহা, তাহা সত্য, এবং মিথ্যা যাহা তাহা মিথ্যা।

সেইরূপ ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃত ভ্রাতৃভাবই ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। ঈশ্বর পিতা, মানুষ ভাই, ধর্ম্মের এই দুটী প্রধান অঙ্গ। প্রথম অঙ্গের সাধন যেখানে প্রকৃতরূপে হয়, সেখানে দ্বিতীয় অঙ্গেরও সাধনও নিশ্চিত হইবে। জগতে প্রথম অঙ্গের সাধন ভাল করিয়া হয় না বলিয়াই দ্বিতীয় অঙ্গের সাধনও হয় না। জগতে এই দুটী অঙ্গের কোনটীরই ভাল করিয়া সাধন হয় না। ধর্ম্মের অবস্থা অতি শোচনীয়। ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে মানুষের মুখেই আছে। কার্য্যগত ধর্ম্ম অতি দুর্লভ পদার্থ। বাহ্যিক ধর্ম্ম অনেক আছে। ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর অনেক আছে। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম কোথায়?

আমি বলিলাম, প্রকৃত ধর্ম্ম কোথায়? প্রকৃত ধর্ম্ম সেই হৃদয়ে, যেখানে পরমেশ্বরের প্রতি যথার্থ ভক্তি আছে। সেই হৃদয়েই মানবের প্রতি প্রকৃত ভ্রাতৃপ্রেম আছে। কিন্তু সেরূপ হৃদয় জগতে কয়টা আছে? ঈশ্বর ভক্তি ও মনুষ্যপ্রেম, এ দুইই এ জগতে অতি দুর্লভ। যদি কখন মানুষ, ঈশ্বরকে প্রকৃতভাবে ভক্তি করিতে পারে, তখনই জগতে প্রকৃত ভ্রাতৃপ্রেম আসিবে। এখন জগতের যে অবস্থা, তাহাতে ভ্রাতৃপ্রেম অতি দুর্লভ।

এ বিষয়ে আর কি বলিব? কয়েকটী মনের ভাব ব্যক্ত করিলাম। এখন পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনি কৃপা করিয়া সেই দিন আনিয়া দিন, যে দিন মানুষ একদিকে তাঁহাকে পিতা বলিয়া ভক্তি করে, আর একদিকে, মানুষকে ভাই বলিয়া ভালবাসে। ভালবাসার অবশ্যম্ভাবী ফল, সেবা। ভালবাসিলেই সেবা করিতে হয়। সেই দিন পৃথিবী স্বর্গ হইবে।

হে প্রভো! সেই দিন আনিয়া দেও, যে দিন মানুষ তোমাকে পিতা বলিয়া ভক্তি করিবে এবং মানুষকে ভাই বলিয়া ভালবাসিবে। জগতে কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা! মানুষ যদি মানুষকে ভাই বলিয়া ভালবাসে, তাহা হইলে কি আর এ দুঃখ যন্ত্রণা থাকে? প্রভো! মানুষ যাহাতে মানুষকে ভাই বলিয়া চিনিতে পারে, এমন শুভদিন আনিয়া দেও। নতুবা জগতের দুঃখ দূর হইবার আর উপায় দেখি না। দয়াকর, দয়াকর, দয়াকর।

জনৈক পরলোকবাসীর আত্মা
মিডিয়ম শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ধর্ম্মবীর ভয়সী। (২)

ভয়সী ও ভাবতবাসী।

ভয়সী ও ভাবতবাসী কেন? ভয়সী ও জগতবাসী বলিলে শোভা পাইত এবং যুক্তিসঙ্গত হইত। তাহাব কাবণ? প্রশস্ত ভাবে ও উন্নত মনে দেখ, বুঝিতে পাবিবে যে, আমবা সকলেই বিশ্বপতি পবমেশ্ববেব সন্তান। ভয়সীও তাই। অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাব সংসার। অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাব পবিবাব। তৎপবিবেষ্টিত হইয়া তিনি সেই সমাগবা শস্যশ্যামলা পৃথিবীকে ভব-নগব-বৎ জ্ঞান কবিতেন। নিজে ভব-নাগবিক ছিলেন। তবে কেন আমবা ভয়সী ও ভাবতবাসী, এই উপশীর্ষক প্রবন্ধে তাঁহাব কার্য্য-ক্ষেত্র সংকীর্ণ কবিযা তাঁহাকে গণ্ডী মধ্যে আনিলাম? এরূপ করাতে তাঁহাব মহত্ত্বেব ক্ষতি বৃদ্ধি হইল না। তাঁহার সার্ব্বজনীন প্রেম যেমন, তেমনি বহিল। ইহাতে নিজেব ক্ষুদ্রতাব পবিচয় দেওযা হইল মাত্র। ইচ্ছা কবিযা কেহ কখন নিজেব ক্ষুদ্রতাব পবিচয় সহজে দেয় না। কার্য্য-ক্ষেত্র সংকীর্ণ না কবিলে ক্ষুদ্র চক্ষে সব দেখা যায় না। তাহা না কবিলে সকাচ-দৃষ্টি যত দূব চলে, তাহার সীমাব বহির্ভূত হইযা যায়। এই নিমিত্ত উল্লিখিত হইয়া সংকীর্ণতাব মূলে ধূসববর্ণা তমসাচ্ছন্না স্বার্থপবতা থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দিয়া এই সত্য উপলব্ধি কবিতেছি। বেশী দূবে যাইতে হইবে না, এই কলিকাতাব রাস্তায় বাহির হও, স্বার্থে স্বর্ণকাবেব দৃষ্টি আপনা হইতে তোমাব অঙ্গ-ধৃত অলঙ্কাবেব দিকে পতিত হইতেছে, চর্ম্মকাবেব দৃষ্টি তোমার পাদুকার দিকে পতিত হইতেছে। স্বার্থপবায়ণতা এমন জিনিস। আমাদিগেব স্বার্থপবায়ণ দৃষ্টি সেইরূপ। জগতবাসী অপেক্ষা ভাবতবাসীব সহিত আমাদিগের নিকটতব সম্বন্ধ, সেই জন্য ভযসীব সহিত ভাবতবাসীব কি সম্বন্ধ, তাহা বিবৃত কবা বর্ত্তমান প্রবন্ধেব উদ্দেশ্য। এই সম্বন্ধ ধর্ম্ম-বিষয়ক এবং অবান্তব ভাবে নীতি ও বাজনীতি-বিষযক। ধর্ম্ম বিষয়ক বলিলে আবাব ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বিষয়ক ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম বিষযক নহে, তাহা বোধ হয স্পষ্টতব লিখিবাব আবশ্যকতা নাই। ৺কেশব বাবু হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মেব পাশ্চা-ত্য ভাব। ৺কেশব বাবু হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মে অপব ধর্ম্ম শাস্ত্রেব সমন্বয় ও সমাদর অর্থাৎ নববিধানেব উৎপত্তি। ৺কেশব বাবু হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মেব চাবিদিকে সুপ্রচার, সম্প্রসাবণ ও দীক্ষা। ভাবতবর্ষেব যে সমস্ত দূবতম প্রদেশের লোক ইহা গ্রহণ কবিলেন, তন্মধ্যে সিন্ধু প্রদেশবাসী অন্যতম। ৺হীবানন্দ আদ্বানী ইহা শুধু গ্রহণ কবিযা ক্ষান্ত রহিলেন না, প্রচাব কার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ কবিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মতিবাম আদ্বানী কার্ত্তিকের মত অতি সুপুরুষ। ইনি বিলাতে গিয়া ব্যাবিষ্টাব হইয়া আসেন। তথায় অবস্থিতি কালীন ভয়সীর কন্যার পাণিগ্রহণ কবেন। ইংবাজেরা এবম্বিধ বিবাহকে মোটের উপর তীব্র নয়নে দেখিয়া থাকেন, দেখিবার কারণও আছে, যথা, মৃত ডাক্তার—দত্তের বিবাহ। কিন্তু সৎপাত্রস্থ হইলে ইংরাজ-কন্যা

সুখী হইয়া থাকেন; যথা মিসেস্ আর, সি, চন্দ্র, মিসেস্ আমীর আলী, মিসেস্ ডাক্তার বিঃ বিঃ দত্ত প্রভৃতি। শুনা যায়, সংসাহসিক ভয়সী আনন্দের সহিত কন্যা দান করিয়াছিলেন। আশা করি, মিসেস্ আম্বানী সুখে আছেন। লেখক একবার বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের কোন এক কর্ত্তৃপক্ষীয়কে একটু বলিয়া দিতে ভয়সীকে লেখেন। তিনি উত্তরে লেখেন যে, তিনি জামাতারই জন্য কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তদন্তর মিষ্টার আম্বানী বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোনও এক জেলা আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ধর্ম্মবীর ভয়সী আপনার রাজনৈতিক মত, ইংরাজীতে যাহাকে political creed বলে, সাধ্যমত লুক্কায়িত রাখিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। তত্রাচ, উহা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িত। উহা উদার। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ যে ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বিশেষ ব্যথিত ছিলেন এবং রাজার গভর্ণমেণ্টের পক্ষ ছিলেন। তবুও এদেশের একদেশদর্শী অন্ধ আন্দোলনকারিগণের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই। তিনি রাজার পক্ষ, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ ছিলেন, পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, এখনও বলা হইতেছে, যেরূপ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই সকলেরই থাকা উচিত, কিন্তু কুত্রাপি সাম্প্রদায়িক শাসনের পক্ষ ছিলেন না। সাম্প্রদায়িক শাসনের যে কুফল, তাহা মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশে উল্লিখিত হইত। 'স্বদেশী' হইয়া দেশের প্রকৃত উন্নতি করে বদ্ধপরিকর হও, বেশ কথা; রাজা ও রাজপুরুষগণ তাহাতে সহায়তা করিবেন ও করিতেছেন, কিন্তু রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ কখনও করিও না, তাহা আত্মঘাতী।

যেমন যোদ্ধার পক্ষে অস্ত্র শস্ত্র, হয় হস্তী, সৈন্য সামন্ত, যেমন বীরের পক্ষে বিদ্যা (রণ) বুদ্ধি ও বল একান্ত আবশ্যক, তেমনি, ধর্ম্মবীরের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রু পরাজয় করিবার জন্য পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়নান্তর আয়ত্ত করা একান্ত আবশ্যক। বাইবেলের কথা দূরে থাকুক, ধর্ম্মবীর ভয়সী অনূদিত ভগবদ্গীতা, জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র, বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র, তালমদ প্রভৃতি বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টের দেবত্ব ও তৎ আনুষঙ্গিক মত খণ্ডন জন্য এবং স্বমত সমর্থন জন্য গীতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেন। উপদেশে বুদ্ধদেব, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও কংফুচের নামোল্লেখ প্রায়ই থাকিত। দেশদেশান্তর হইতে বিধর্ম্মী প্রচারকগণ গমন করিলে, তাঁহাদিগের সহিত সানন্দে ধর্ম্মালাপ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক সিংহল-নিবাসী ও কলিকাতা-প্রবাসী শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মপালও তাঁহার সহিত আলাপে উপকৃত হইয়া প্রত্যাগত হন। অধ্যয়নোদ্দেশে নববিধান সমাজের ৺নগেন্দ্র নাথ মিত্র ইংলণ্ডে গমন করিয়া তাঁহার বেদীতে উপদেশ দেন। ইহা, তার পর, তাঁহার উপদেশ-শ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। তাহার পর পণ্ডিতবর ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিলাত গমন করেন; তিনিও তদ্রূপ অভ্যর্থনা ও আদর পান। শাস্ত্রী মহাশয়েরও তথাকার প্রদত্ত উপদেশ ভয়সীর প্রদত্ত উপদেশাবলীর অন্তর্ভূত। তিনি স্বর্গারোহণ না করিলে রবিবাবুও নিশ্চয়ই তাহার মুক্ত হৃদয়ে স্থান পাইতেন। একদা শাস্ত্রী মহাশয়, বোধ হয়, ব্রাহ্মসমাজের

বর্ত্তমান অবস্থা এবং ব্রাহ্ম বালক বালিকা সম্বন্ধে ভয়সীকে একখানি পত্র লিখেন। সাপ্তাহিক উপাসনা কালীন লোক হয় না, প্রায়ই আসন শূন্য থাকে বলিয়া ধর্ম্মবীর সর্ব্বদা আক্ষেপ করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় নিজের চিঠিতে যে সমস্ত লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদায় প্রকাশ করা অনাবশ্যক বোধে ভয়সী আপনার অভিপ্রায় মত তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এবং ভজনালয়ে সাধারণের উপস্থিতি বিশেষতঃ আসনগ্রাহী সভ্যগণের ও অন্যান্য সভ্যগণের উপস্থিতি যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা প্রতিপন্ন করেন। একাকী স্থানান্তরে থাকিয়া উপাসনা করিলে যে দোষ এবং সমাজ গৃহে সমবেত হইয়া উপাসনা করিলে যে উপকার হয়, তাহাও ইহাতে এবং উপদেশান্তরে বারম্বার প্রতিপন্ন হয়।

কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ ইংরাজসাধারণের আধ্যাত্মিক হিত সাধনার্থে হাইকোর্টের পূর্ব্বদিকে কেল্‌নার কোম্পানীর এসিষ্টাণ্ট সাহেবের উদ্যোগে একটী অস্থায়ী শাখা প্রার্থনা-সমাজ সংস্থাপিত হয়। সাহেবের নাম মনে হইতেছে না, প্রতি রবিবারে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এই স্থানে ইংরাজিতে উপাসনা হইত। ইংরাজ, বাঙ্গালী, মেম সাহেব ও বাঙ্গালী মহিলাগণও উপাসনায় যোগদান করিতেন। কিছু দিন সুন্দররূপে চলিয়াছিল। তারপর নাকি স্থাপিয়াতাকে তন্নিবন্ধন নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি পদচ্যুত হন এবং স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন। ইহারপর নাট্যাভিনয়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভবানীপুর ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ বা Theistic Church সংস্থাপিত হয়। উক্ত কর্ম্মচারী সাহেব চলিয়া গেলে বা ভবানীপুরে নব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, সাহেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত উপাসনার কার্য্য বন্ধ হয়।

মহাত্মা ভয়সী-প্রদত্ত উপদেশের এক এক খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট মূল্য যদিও এক এক আনা ছিল, তত্রাচ ইহা অনেক স্থলে বিনা মূল্যে ও বিনা ডাক খরচে বিতরিত ও প্রেরিত হইত। সকল সমাজেই তাহা পাঠান হইত। তদ্ভিন্ন তিনি উপযুক্ত অথচ মূল্য দানে অসমর্থ ব্যক্তিকে, কেবল তাহা কেন, তাঁহার প্রণীত অমূল্য গ্রন্থাবলীও দান করিতেন। লেখক তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারবর্গের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী। কেহ তাঁহাকে লিখিলেই সেই ব্যক্তি মূল্য দিন বা নাই দিন, তদ্বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া, তিনি তাঁহাকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ধর্ম্মোপদেশ পাঠাইয়া দিয়া চির বাধিত করিতেন। যাঁহারা তাহাও করিতে প্রস্তুত থাকিতেন না, অথচ তাহা পাঠ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি লেখকের মত মূঢ় ব্যক্তির মারফতে আলোক প্রদান করিতেন।

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট পত্র। (৩)

ভক্তিভাজন

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম-এ,
মহোদয় সমীপে।

আপনার রচিত ইতিহাসের প্রথমখণ্ডের ১৩৫ পৃষ্ঠায় আপনি লিখিতেছেন "The Indian Mirror long known as the organ of Mr Sen's party." পুনরায় আপনি ঐ গ্রন্থের ১৪৮ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন "Every fortnight the Indian Mirror the able organ of the younger party." আপনি বহুস্থানে নিজের উক্তির দ্বারাই ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রকে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অধিকারের বস্তু বলিয়া উল্লেখ করিয়া, পরে ঐ পত্রিকা লইয়া যখন উভয়দলে কলহের কারণ উপস্থিত হয়, তখন কি জন্য মহর্ষির প্রতি কেশবচন্দ্রের পত্রিকা সম্বন্ধীয় আচরণ লইয়া আপনি ১৬৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, "A sad return for the kindness uniformly shown by him. However I leave the reader to form his own opinion on this most painful part of the quarrel."

আপনার নিজের ভাষায় অন্ততঃ একাধিক স্থানে তখনকার মিরারকে কেশববাবুর কাগজ বলিয়া, পরে মহর্ষির প্রতি কেশববাবুর ব্যবহার আলোচনা করিতে গিয়া ঐরূপ তীব্র শ্লেষবাক্য ব্যবহার করার কি প্রয়োজন ছিল, বুঝি না। আর ঐ রূপ অবজ্ঞা-সূচক ভাষার সামঞ্জস্য ও অধিকার কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন? আর আপনার বক্তব্যের শেষভাগে যে পাঠককে তাঁহার নিজের মত ও ধারণা নিজেই করিয়া লইতে বলিয়াছেন, ইহারইবা তাৎপর্য্য কি? আপনি আপনার নিজের ভাষায় কেশবচন্দ্রকে কি কিছু বলিতে বাকী রাখিয়াছেন? মানুষ মানুষকে আর কি বলিবে? আপনি তাঁহাকে "কৃতঘ্ন" কথাটা না বলিয়া আর সবই বলিয়াছেন। বাস্তবিক কি ইহাই আপনার মনের ভাব? তাহাই যদি হয়, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে তাহার মিল থাকে না। অনুগ্রহ করিয়া ইহার একটা সদুত্তর দিবেন কি? কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার দল আপনাদের প্রতি এবং আপনারা তাঁহার ও তাঁহার দলের প্রতি যে সকল ভাষা ইতিপূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছেন, সে তুলনায় ইতিহাসের দিক দিয়া ঠিক খাঁটি সত্য বলায় দোষ কি? ঐ উভয় বিরোধী ভাবের মধ্যে কোন্‌টা আপনার হৃদ্‌গত বিশ্বাস, তাহা জানিতে চাই, এবং জানিতে চাহিবার অধিকারও আছে বলিয়া মনে করি।

১৮৬২ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র, আচার্য্যপদে নিযুক্ত হইবার দিন, সপরিবারে ঠাকুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন বলিয়াই, সেইদিন বা তৎপরে কোন সময়ে তাঁহার কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্ম পরিবার গঠিত হয় নাই। কাহাদের দ্বারা সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্ম পরিবার গঠিত হইয়াছিল, আপনার গ্রন্থে তাহারও উল্লেখ নাই। সে সময়ে বহু ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেও তাঁহাদের গৃহিণীগণের ব্রাহ্মসমাজে আসিতে ও যোগ দিতে বিলম্ব হইয়াছিল। কোনও একটী পরিবারই সর্ব্বপ্রথম বহু ব্রাহ্মের মিলনক্ষেত্র ও আরাম স্থানরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল। এইরূপ

যত্ন শ্রাদ্ধের সমাগমে, পরিচর্য্যা ও সমাদর প্রদর্শনে যে পরিবারটী সর্ব্বদাই মুক্তহস্তে অপেক্ষা করিতেন, এবং সে জন্য সন্তুষ্টচিত্তে নানা অসুবিধা নিয়ত ভোগ করিতেন, তাঁহার ও তাঁহার গৃহিণীর এবং তাঁহাদের কন্যাগণের সে সময়ের মুক্তভাব উল্লেখযোগ্য, কারণ মরুভূমির মধ্যস্থলে তাঁহারা শ্রান্তিক্লান্ত ব্রাহ্মগণের পক্ষে তৃপ্তির হেতু ও আরাম স্থান হইয়াছিলেন। আপনার গ্রন্থে এই পরিবারের এরূপ সেবাপ্রিয়তার কোন উল্লেখ নাই। স্বর্গীয় কিশোরী লাল মৈত্র মহাশয়ের পরিবারই কি সেই মিলন-স্থান ছিল না? ব্রাহ্ম সমাজে মৈত্র মহাশয়ের স্থান অতি উচ্চ, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তাঁহার বহুবিধ উল্লেখযোগ্য গুণাবলীর বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ নীরব, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্ব প্রথম তিনিই "ঝাড়ে বংশে" যোগ দিয়াছিলেন এবং সকল কাজে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ইং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ প্রাচীন কাল বলিলেই হয়, ইহা আজ কালের কথা নহে। ইহার পরবর্ত্তী কত ঘটনায় আপনি আপনার পরিচিত বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিগণের ত্যাগস্বীকার সম্মানসহকারে নামোল্লেখসহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ ঘটনা রাশি রাশি বর্ত্তমান। সে গুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, আর তত প্রয়োজনও নাই, কিন্তু ঐ ইতিবৃত্তে কলিকাতার ১০।১২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে গোবিন্দপুর নামক পল্লীতে একটী ভদ্রলোকের ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন জন্য কলিকাতা হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণকে তথায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। আপনার ইতিহাসের ১ম খণ্ড ১৪৯ পৃষ্ঠা। আপনি একই ব্যক্তির একই কার্য্য কত স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে আমি কেবল একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আপনার ২য় খণ্ডের ১৮৪ পৃষ্ঠায় ও ২০৮ পৃষ্ঠায় একই ব্যক্তির বিষয়ে যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ অনেক আছে। কিন্তু গোবিন্দপুর গ্রামে যে ভদ্রলোক ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তাঁহার বিষয় কি আপনার কিছুই জানা নাই? আপনি কি তাঁহাকে চিনিতেন না? সেই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার যে উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, ব্রাহ্মসমাজের সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে সেরূপ নির্য্যাতন-ভোগ কি আর কোথাও পাইয়াছেন? গোবিন্দপুর-নিবাসী এই মহামান্য পরিবার লোকটী ধর্ম্ম বিশ্বাস রক্ষার জন্য গ্রামবাসী কর্ত্তৃক যত প্রকার নির্য্যাতনে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে তাঁহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার মুখে বিষ্ঠা দান ও তাহা ভক্ষণ করাইতে চেষ্টা করার বিবরণ কি আপনি অবগত নহেন? এরূপ অত্যাচার কি আপনি কোথাও শুনিয়াছেন? কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সকল ব্রাহ্মই ত তাঁহাকে জানিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি আমাদের মধ্যে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, আপনিও তাঁহার সমাদর করিতেন এবং তাঁহার দুঃখ কষ্ট ও বিপদে সহায়তা করিয়াছেন, দেখিয়াছি। কিন্তু ইতিহাসে কি এরূপ নগণ্য ব্যক্তির নামোল্লেখে কিছু আপত্তি আছে নাকি? ইঁনিই কি স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ বিশ্বাস নহেন?

আপনি ভারত-আশ্রমের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে গিয়া আপনার নিজের ভাষায় যেরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আপনার ধারণা, কি সে সময়ের প্রতি-

ভাতাগণের ধারণা, তাহা বুঝা যায় না। আপনি বলিতেছেন—

"The Ashram was to introduce ideas of religious and moral discipline into Brahmo families, to train them to ideas of neatness, order, punctuality and domestic devotions which form such striking features in a well-regulated middle class English home" ২৫২ পৃষ্ঠা। এই টুকু উদ্ধৃত করিয়াই নীরব সমালোচনা করিলেই ভাল হইত। কিন্তু আমার একটু জানিবার আছে, তাই নীরব হইতে পারিলাম না। আমি এখানে এমন দুএকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহাতে আপনার বর্ত্তমান প্রিয় শিষ্যগণ অবশ্যই আমাকে প্রাচীন সমাজের আঁস্তাকুড়ে বসাইয়া শান্তি অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ভারত-আশ্রম কি 'middle class English home" প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন? আপনিও ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখস্থ ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বৃহৎ অট্টালিকা ভাড়া লইয়া নূতন আদর্শে ভারত-আশ্রম প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেখানেও কি এই "middle class English home" গঠিত হইয়াছিল? ভারতের জল বায়ু, ভারতের শোণিত-বীর্য্যে গঠিত দেহ, ভারতের পুরুষপরম্পরাগত রীতি-পদ্ধতির মাঝখানে কেবল কয়েকদিনের পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বল লইয়া এরূপ আদর্শে পরিবার গঠন চেষ্টা কি বাতুলের কার্য্য নহে? এই বাতুলের কার্য্যে কি কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁহার আদর্শে আপনিও পরিবার গঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন? নীতি ও ধর্ম্মের শাসনাদর্শ কি কেবল ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত পরিবারেই আবদ্ধ, সে আদর্শ এ হতভাগ্যদেশের কোথাও কোন দিন কি ফুটিয়া উঠে নাই? আপনি আপনার রচিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "যুগান্তরে" বিশ্বনাথ তর্কভূষণের যে চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কি ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত পরিবার হইতে গৃহীত আদর্শ? না, আপনার চিরপূজনীয় মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের চরিত্র-চিত্র? আপনার উক্তিই ঠিক, না আপনার প্রাচ্য আদর্শই ঠিক, কোন্‌টা ঠিক? যদি বলেন, সেরূপ আদর্শ অনেক পাওয়া যায় না, বিদ্যাভূষণেই পর্য্যবসিত, তাহা হইলেও আমি গভীর মনস্তাপে এই কথাই বলিব যে, যিনি নিজের ঘরের সাতরাজার ধন এক মাণিক ফেলিয়া পরের দেশের কাচখণ্ড কুড়াইয়া মরেন, তিনি নিজেও প্রবঞ্চিত এবং অজ্ঞাতসারে অপরকেও প্রবঞ্চিত করেন। সকল বিষয়েই ব্রাহ্মগণ প্রতীচ্য-মুখীন্ হইয়া দেশের ও নিজেদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন। এ দেশের এই অধঃপতনের দিনেও এরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য গৃহস্থ একবারে লোপ পায় নাই, যাঁহাদের আদর্শ অনেক অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মসাধারণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আক্ষেপের সহিত বলিতে হইতেছে, আমি আমার বাল্য-জীবনে আমার পিতৃগৃহে আমার পিতৃদেবের ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সকলেরই যে উচ্চ মহদাচরণ সকল দর্শন করিয়াছি, নিজ জীবনে তাহার এক আনা পরিমাণও ফলাইয়া তুলিতে পারিলাম না। "idea of religious and moral discipline" আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের আচার আচরণে এরূপ ভাবে প্রস্ফুটিত দেখিয়াছি, যাহা স্মরণ করিলেও অন্তরে আনন্দের সঞ্চার হয়। অসুস্থতাবশে বার মাস ত্রিশ দিন, অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যাবন্দনাদি ও নিত্য তর্পণ করা যথারীতি সম্পাদিত হইত, ঠিক সময়েই হইত। আর কি বলিব, "চণ্ডীপাঠ কালে" তাঁহার মুখমণ্ডলে

ভক্তিমাখা গদগদ ভাব সন্দর্শন করিয়া আমার বাল্য-হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিত, তাহাই, আপনাদের আশীর্ব্বাদে ও উপদেশে আজও জীবন্ত ভাবে আমার হৃদয় মন অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং নীতি ধর্ম্মের আদর্শ গ্রহণের জন্য মধ্যবিত্ত ইংরাজ গার্হস্থ্য জীবন দেখিবার বা গঠন করিবার প্রয়োজন বোধ হয় না, আমার "বাবার ঘর" গড়িয়া তুলিতে পারিলেই জীবন ধারণ সার্থক মনে করিতাম। তাহার পর "neatness, order, punctuality and domestic devotion" সম্বন্ধে পিতৃদেব ও তাঁহার ন্যায় সে সময়ের গ্রাম্য গৃহস্থগণের জীবনে যাহা দেখিয়াছি, কোনও মধ্যবিত্ত ইংরাজ গৃহস্থ, তাহা জীবনে ফুটাইয়া তুলা দূরের কথা, স্বপ্নেও দেখেন নাই। হায়! অনেক কথাই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু স্থান নাই, অবসরও নাই, কেবল এই মাত্র বলি যে, পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, সময়ের সদ্ব্যবহার এবং পারিবারিক জীবনে আত্মসমর্পণ ইত্যাদি বিষয়ে এদেশে কি দৃষ্টান্তের কিছু অভাব ছিল? আমার ত মনে হয় না। যে দেশে বার মাসে তের পার্ব্বণে ও নিত্য কর্ম্মে গৃহস্থগণ রত ছিলেন, সে দেশের সেই সকল অনুষ্ঠানে কি ঐ সকল ভাবের পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই? আপনার কথিত গার্হস্থ্য জীবনের গুণগুলির অত্যুত্তম বিকাশ এখনও এদেশের পল্লী জীবনে দেখান যাইতে পারে। আর ব্রাহ্মসমাজে আমাদের যত্ন চেষ্টায় যে কতকগুলি ইংরাজী ঢংএর মধ্যবিত্ত পরিবার গঠিত হইয়াছে, সেই সকল পরিবারের আদর্শ এই যে, একশত টাকা মাসিক আয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কঠিন ব্যাপার, তাই তাঁহারা দয়া করিয়া একশত টাকা আয়ের পরিবারের গৃহিণীরা সকল ব্যয় সঙ্কুলন করিয়া মাসে মাসে পাঁচ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিলে পুরস্কারের যোগ্য হইবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছিলেন। বড়ই লজ্জার কথা, ইহাকেই আবার আপনি ইতিহাসে আদর্শ স্থানীয় করিয়াছেন, করুন, কিন্তু আমার শেষ জিজ্ঞাস্য এই যে, ভারতীয় গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব পরসেবাকে কোথায় স্থান দিলেন? ইংরাজ-মধ্যবিত্ত পরিবারে কতটা পরিমাণে এই মহা-ধর্ম্মের সাধন হইয়া থাকে, জানিনা, আপনি কয়েক মাস বিলাতে বাস করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং আপনি বলিতে পারেন। আত্মীয় স্বজন হইতে আরম্ভ করিয়া অপরিচিত ভদ্রাভদ্র সকল লোককে স্থান ও অন্নদানটা কি শেষে ঠাকুরমায়ের রূপ কথায় পরিণত হইবে? এ দেশে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় কি হোটেলের আবির্ভাব হইবে না কি? এই দুর্দ্দিনে এখনও অন্ন-দানটা আছে, ব্রাহ্মসমাজে উঠিয়া আসিয়াছে, এবং আমাদের কৃপায় দেশ হইতে উঠিতে বসিয়াছে। এদেশে পূজা ও শ্রাদ্ধাদিতে অবারিত অন্নদান মহাধর্ম্ম। ব্রাহ্মেরা দুটীর কোনটাতেই অন্নদানের ব্যবস্থা রাখেন নাই। ভিক্ষাদানও বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। এরূপ স্থলে মধ্যবিত্ত ইংরাজ পরিবারের আদর্শ যতই গৃহীত হইবে, ততই দেশের "দয়া-ধর্ম্ম" রাণপ্রস্থ অবলম্বন করিবে, ইহাই কি ঠিক নহে? ভারতবর্ষের পুণ্যক্ষেত্রে ইংরাজ গার্হস্থ্য জীবনের বাঁধা কলম বসাইলে, সব আঁটির চারা গুলি লোপ পাইবে, এ দিকে আপনার দৃষ্টি পড়ে নাই? অবশ্য আমি স্বীকার করি, ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও নীত সকলের নিকট আমার এ আলোচনা অরণ্যে রোদন, কারণ এখানে বিলাতী হাওয়া বহিতেছে, এবং বিলাতী ছাঁচে সংসার জীবন

গঠন অনিবার্য্য, কারণ বাক্যে ও ব্যবহারে যখন এত গোল, তখন পরিণাম নিরাপদ নহে। আমার আক্ষেপ ও মনস্তাপের কারণ এই যে, এই সে দিন আপনি আপনার পরম পূজনীয় পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ বাসরে তাঁহার যে সকল মহীয়সী গুণাবলী ও পুণ্যকাহিনীর আলোচনা করিলেন, এবং সে সকল শ্রবণ করিয়া শ্রোতাগণ আপনার পিতৃদেবকে দেবপদবাচ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন, আপনার সমগ্র জীবনের পরম সম্বল সেই পিতৃ-চরিত্র সম্মুখে থাকিতে, আপনি কোন্ প্রাণে ইংরাজ আদর্শে এ দেশের পারিবারিক জীবন গঠনের উপদেষ্টা হইলেন, এবং ইতিহাসেও সেই আদর্শকে স্থান দিলেন? আমরা যতই চেষ্টা করি, এ আদর্শে এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে না। এদেশে ব্রাহ্ম জীবন যাপন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পন্থা ভিন্ন রূপ।

ইতিহাসের ২য় খণ্ডে আপনি অনেকগুলি জীবিত ও মৃত সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকার পরিচালকগণের কর্ম্মপটুতার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু "The Brahmo Public Opinion"এর পরিচালনায় মিষ্টার আনন্দমোহন বসু এবং মিষ্টার দুর্গামোহন দাস মহাশয় দ্বয়ের অর্থ সাহায্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সমাজের কার্য্যে সহায়তা করিলেও ঐ সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকা খানি তাঁহাদেরই সম্পত্তি ছিল এবং দীর্ঘকাল সমাজের সেবা করিয়াছে। ইহাই কি যথেষ্ট? এই পত্রিকার সময়োপযোগী পরিচালন ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাঁহাদের বিষয়ে একটী কথাও বলেন নাই কেন? আপনি অবশ্যই জানেন যে, ঐ পত্রের উত্তম পরিচালনে শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন দাস মহাশয়কে সে সময়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, এবং আপনার কথিত "political agitator" শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সহকারী রূপে পত্রিকার সৌষ্ঠব সম্পাদনে প্রচুর ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন।

আপনার ইতিহাসের ২য় খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠায় সাধারণ সমাজের উপাসনা মন্দিরের নিকটবর্ত্তী পল্লীর নানা সুবিধার উল্লেখ করিয়া আপনি বলিয়াছেন, ইহাতে মিষ্টার আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বসু মহাশয়ের উদ্দেশ্য কি ইহাই ছিল, না আরও কিছু ছিল? বিশেষ ভাবে তাঁহার যে উদ্দেশ্য ছিল,তাহা কি সুসিদ্ধ হইয়াছে? আপনি ইহাই কি মনে করেন? আপনার অবশ্যই স্মরণ আছে যে, আপনার কনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনীর পীড়ার সময়ে একবার ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় কয়েক দিন ঐ পল্লীতে আপনার কন্যার চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিলেন, তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও আপনাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন। তিনি মন্দির-সংলগ্ন পল্লীর বিষয় আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আপনি কি তাঁহার সে প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন, "Nearer the church further from God. শাস্ত্রী এটা জান না," এ পল্লীর সকলে কি এই মন্দিরের উপাসনায় আসিয়া থাকে? যদি সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ না হইয়া থাকে, তবে আর কি মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, বুঝা গেল না।

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় যখন প্রচার কার্য্যের উত্তমরূপ ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই, সেই অসময়ে প্রমদাচরণ সেন লোকান্তর গমন কালে যে উইল করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের

স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের জন্য সর্ব্ব প্রথম পাঁচ শত টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয়ের আলোচনা-ক্ষেত্রে সেই যুবকের এই মহা দানের মহৎ ফলের উল্লেখ করা উচিত ছিল, কারণ ইহা হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য স্থায়ী তহবিলের সৃষ্টি হয়। আপনি অনেক সামান্য দানও ইতিহাসে নামোল্লেখ সহ লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার যখন অর্থের অভাবে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া যায় যায়, তখন যাঁহার এক সহস্র মুদ্রা সাহায্য পাইয়া ম্যালেরিয়া-মুক্ত বীরের ন্যায় মেসেঞ্জার কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইল, সে দাতাকে আপনি জানেন, অথচ নামটী করিলেন না কেন? দানের সঙ্গে জাত বিচার আছে নাকি? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে আপনার ইতিহাস বাৎসরিক আকার ধারণ করিয়াছে। অনেক স্থলে বৎসরের পর বৎসর প্রাচীন কাহিনী গুলির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণে দেখা যায়, শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় নূতন করিয়া বাঘ-আঁচড়ায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঠিক এই সঙ্গে সঙ্গে নলহাটী ও বড়বেলুনে ব্রাহ্মমিশন খোলা হইয়াছিল। সে গুলির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সময়ে এবং উহার পূর্ব্বে দীর্ঘকাল "২৪ পরগণা বান্ধব সমিতি" নামে একটী কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই সমিতির সভাপতি ছিলেন, ডাঃ নীলরতন সরকার সম্পাদক, আপনি এবং অন্য অনেকে সে সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহারা ২৪ পরগণার নানা স্থানে প্রচার কার্য্যে অনেক দিন সাহায্য করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে তাঁহারা নিরাধাই, দত্তপুকুর, ছোট জাগুলিয়া, নপাড়া, উত্তর বারাসত, দক্ষিণ বারাসত, জয়নগর, মজিলপুর, হরিনাভি, কোদালিয়া, নিতাড়া, উস্তি এবং ডায়-মণ্ড হারবার ইত্যাদি বহুস্থানে বহুদিন ধরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এবং আপনার বিলাত যাত্রা কালে এই সমিতিই আপনাকে লিখিত সম্ভাষণ পত্রে অভিনন্দিত করিয়া মহাসমারোহে বিদায় দিয়াছিলেন। সে দিনকার সে সভায় অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। সে দিন আপনার প্রতি সমাদর প্রদর্শনে ও আহার আপ্যায়নে অনেক গুলি টাকাও ব্যয় হইয়াছিল। সে সকল ক্ষুদ্র মিশন বিষয়ে আপনার দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে অনুল্লিখিত প্রচার সমিতিটী প্রধান স্থান পাইবার কথা। আশ্চর্য্য এটা-কেও আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের প্রদত্ত অভিনন্দন আজিও যে অনেকের ঘরে ও আপনার গৃহে বর্ত্তমান।

আপনার রচিত ইতিহাসের দ্বিতীয়খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি, আপনি লিখিয়াছেন, "In this year's report (1901) we also find for the first time mention of the already noticed institution called Bharat Mahila Samiti, literary Indian Women's League *** It was a little society started by some Brahmo ladies, notable amongst whom was Mrs Kadambini Lahiri a typical Brahmo widow, who also started and maintained for sometime a 'widows' home' আপনি এই সামান্য অনুষ্ঠানটী ধরিয়া আপনার স্নেহের পাত্রী শ্রীমতী কাদম্বিনী লাহিড়ীকে অমরত্ব দানে প্রয়াসী হউন, তাহাতে আমা-দের আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না, কিন্তু নিম্নাংশে যে অল্পায়ু বিধবাশ্রমের উল্লেখ করিয়া শ্রীমতী কাদম্বিনী লাহিড়ীর গুণবর্ত্তার পরিচয় পাড়িয়াছেন, সে তুলনায় বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমের কি অপরাধ

হইল? আর সেই দীর্ঘকাল-স্থায়ী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা দম্পতিযুগলের ত্যাগ-স্বীকার, অর্থ-ব্যয় ও নির্য্যাতন-ভোগ কি আপনার স্মরণ-পথে উদিত হইল না? বরাহনগর-বিধবাশ্রমের মধ্যে ঠিক এক লাইনে শেষ করিয়া গিয়াছেন কেন? সে আশ্রম যে কলিকাতাতেও অনেক দিন ধরিয়া কার্য্য করিয়াছেন। একটী আদটী নয়, অনেক অনেক বিধবা সে আশ্রমে স্থান পাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন এবং অনেকে বর্ত্তমান জনসমাজে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতেছেন। ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্য্যায়, শ্রদ্ধেয় শশিপদ বাবুর গৃহিণী স্বর্গীয়া গিরিজাকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজ কন্যাগণের সঙ্গে কোনও পার্থক্য ছিল না, ইহাত আমরা অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আপনিও দেখিয়াছেন। যে দিন গিরিজাকুমারী দেবীর স্বর্গারোহণ সংঘটন হয়, সে দিন যে এই শ্রেণীর বহুপালিতা কন্যা সেই শবপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কন্যার ন্যায় অশ্রুপাত করিয়াছেন, এ দৃশ্য ত আপনার গৃহসমীপেই ঘটিয়াছিল। তাহার পর, এই বিধবা-আশ্রমটী ১৬ বৎসর কাল কার্য্য করিয়া লোপ পাইবার সময় অর্থাভাবে বা ছাত্রীর অভাবে উঠিয়া যায় নাই। বরাহনগর ও বাঙ্গালাদেশে এই আশ্রমটীর ভার লইবার লোকাভাবে উঠিয়া গিয়াছে। শশিপদ বাবুর ভগ্ন স্বাস্থ্য ও তদীয় গৃহিণীর দীর্ঘ রোগভোগ নিবন্ধন তিনি এই আশ্রমটী ব্রাহ্মসমাজকে লইতে ও রক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াছিলেন, ও তৎ সঙ্গে বরাহনগরের আশ্রম-বাটী, স্থায়ী একশত টাকা আয়, আর গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত মাসিক ৭৫৲ টাকা বৃত্তি বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং থাকিবার স্থান ও প্রতিপালনের অর্থের অভাব ছিল না। কেবল ব্রাহ্মসমাজের উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যে অতবড় একটী স্থায়ী কীর্ত্তি উঠিয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ কেন আশ্রমটীর ভার লইতে পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, তাহা আরও রহস্যপূর্ণ। সমাজের সপ্তদশ পরিচালক মিলিত হইয়া অবশ্যই এই গুরুভার গ্রহণে, তত্ত্বাবধানে ও ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য নানাবিধ সদুপায় অবলম্বনে সক্ষম ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহারা সে বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, কারণ কেবল ঐ "বিধবা-আশ্রমের" নামকরণে একটী হিন্দু শব্দ যুক্ত ছিল বলিয়া, অর্থাৎ "বরাহনগর হিন্দু বিধবা আশ্রম" এই নামে আশ্রমটী পরিচিত ছিল বলিয়া, উহার পরিরক্ষণ ও প্রতিপালন ভার গ্রহণে ভয় পাইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন। আশ্রমটী উঠিয়া গেল। আপনার ইতিহাস-বিদিত ব্রাহ্মগণই এই হিন্দুর দেশে ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিবেন বলিয়া কোমর বাঁধিতেছেন। হিন্দু নামের ভয়ে অতবড় একটী আশ্রমের ভার গ্রহণের লোকাভাব ঘটিল ও উঠিয়া গেল। অথচ এরূপ লোক সমষ্টির ইতিবৃত্ত রচনা না করিলেই নয়। আপনার কথিত শ্রীমতী লাহিড়ী-প্রতিষ্ঠিত স্বল্পকাল স্থায়ী বিধবা-আশ্রমটী অনেক পরের ঘটনা। ভারতবর্ষে বিধবা-আশ্রম সর্ব্ব প্রথম বরাহনগরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আর একটী কথা, শ্রীমতী লাহিড়ীর আশ্রমের পরিচালন বিষয়ে সভাপতিরূপে গিরিজাকুমারী বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে অলঙ্কারাদিও অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন।

বিধবা বিবাহ ও বিধবাগণের সুশিক্ষা বিধানের জন্য স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরেই, এই সদাশয় ও সহৃদয় পুরুষ শশিপদ

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উচ্চকণ্ঠে গীত ও অমর লেখনীতে লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য, কারণ এই বন্ধুসন্তান কেবল বাঙ্গালা দেশে বিধবা-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিধবা-জীবনের বিবিধ উন্নতি সাধন চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিভাগেও ঐরূপ সদনুষ্ঠান জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। পুনাতে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, এবং অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, পুনার বিধবা আশ্রম শশিপদ বাবুর নিকট অর্থ ও উপদেশ বিষয়ে কতটা ঋণী। এই সকল বিষয়ে আপনার ইতিহাস নীরব কেন? এ সকল বিষয় সংগ্রহ করা ত আপনার পক্ষে কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না। আপনি ত এ সকল উপকরণ শশিপদ বাবুর নিকট চাহিয়া লইয়াছিলেন। তবে কেন এমনটা হইল? অথচ আপনার সাধনাশ্রমের খুঁটিনাটী বিবরণমালা সংগ্রহ করিতে আপনি বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। আমার অধিক বলিবার নাই, কেবল আপনার ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্যে অজ্ঞাতসারে দুই একটী অসত্য ঘটনা স্থান পাইয়াছে, আগামী বারে সেইগুলি দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব। আপনার যে কার্য্য আমরা সাদরে মাথায় করিয়া লইব, সেই গুলির এরূপ আলোচনায় নিজেই দুঃখিত আছি। প্রণত শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকট প্রেম বা জেনেরেল বুথ।

জন্ম—নটিনগ্যাম, ১৮২৯।
মৃত্যু—২০শে আগষ্ট ১৯১২।

জগতে অনেক লোক আছে, যাহাদের নাম আছে কিন্তু কর্ম্ম নাই,—শোয়া বসা, খাওয়া পরাই যাহাদের একমাত্র কর্ম্ম। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে, যাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি, ধন ঐশ্বর্য্য, মান প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু ধর্ম্ম নাই, চরিত্র নাই। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে, যাহাদের মান সম্মান, ও ধর্ম্ম চরিত্রও আছে, কিন্তু পাপী দরিদ্রের প্রতি যাহাদের ভালবাসা ও সাহানুভূতি নাই। দরিদ্রদিগকে বিবেকানন্দ বলিতেন,"প্রকট নারায়ণ,"শ্রীচৈতন্য বলিতেন, "জীবে দয়া"—খ্রীষ্ট বলিতেন "Thou shalt love thy neighbour as thyself." * "Love your enemies, do good to them which hate you." † ম্যাট-সিনী বলিতেন,"Love and respect women" ‡ যখন পৃথিবীর লোক ধনৈশ্বর্য্যের গরিমায় আত্মহারা,এহেন কালে এমন এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বীরদর্পে বলিয়াছিলেন,

"Love and love poor sinners Love the souls of the men and women who are walking past your doors down to despair. Come and love the souls of the children trained in sin, the souls of the poor fallen women as they wander about the streets."

তিনি আর কেহই নহেন, তিনি প্রাতঃস্মরণীয় অদ্বিতীয়-মানব-হিতৈষী উইলিয়ম বুথ। হায়, তিনি বিগত ২০শে আগষ্ট, মঙ্গলবার, স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে জগতের চতুর্দ্দিকে হাহাকার

* St Mathew, chap XXII, 39

† St Luke, Chap VI, 27, 28, 29.

‡ On the duties of man p. 320

উত্থিত হইয়াছে! ইংলণ্ড অমূল্য রত্নহারা হইয়াছে !!

"জীবে দয়া" প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্য দেশ-ত্যাগী হইয়াছিলেন, সত্য কথা ঘোষণার জন্য খ্রীষ্ট ক্রুসে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, ম্যাট্‌সিনী মানবের সম-অধিকার প্রচারের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, পাপীর প্রতি দয়া প্রচারের জন্য বুথ নির্ম্মমভাবে কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার Darkest England প্রকাশের জন্য কত না উপহসিত হইয়াছিলেন॥ আজ চতুর্দ্দিকে তাঁহার প্রশংসা; কিন্তু এমন দিন গিয়াছে, যখন কোন চার্চ্চে তাঁহাকে উপাসনা করিতে দেওয়া হইত না। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কোন গির্জ্জায় উপাসনা বা বক্তৃতা করিতে তিনি অধিকার পান নাই. কেবল থোবরণ সাহেবের মেথডিষ্ট গির্জ্জা তাঁহাকে বক্তৃতার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। বক্তৃতা শুনিতে নয়, তাঁহার দেবোপম মূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হইতে গিয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম, সে ত মূর্ত্তি নয়, সে যেন আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ। যখন তিনি বলিতেছিলেন,—"আমার সমগ্র শাস্ত্র তন্ত্র "Love"-য়ে নিবদ্ধ, তখন বুঝিয়াছিলাম, সে ত মানুষ নয়, কোন্ দেবলোক হইতে যেন একটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ আসিয়া পৃথিবীতে পড়িয়াছে। সে স্ফুলিঙ্গে কত পাপী দ্বিজত্ব পাইয়াছে, কত নারকী উদ্ধার হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? যে জীবন প্রেমে আরম্ভ, প্রেমে পরিণত, প্রেমচর্য্যায় পরিসমাপ্ত, সে জীবনের তুলনা কাহার সহিত করিব? জর্জ্জ ফকস্ নন, ইগনেসিয়স লয়লা নন, জন ওয়েসলি নন, কাহারও সহিত তিনি তুলিত হইতে পারেন না। যদি কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য এবং ম্যাটসিনীর সহিত তুলনা করিতে পার। কিন্তু তাহাও ঠিক হইবে না। তিনি ছিলেন, বিধাতার প্রকট প্রেম মূর্ত্তি। মনে হয়, এমন দেবোপম মূর্ত্তি পৃথিবীতে আর কুত্রাপি দেখা যায় নাই।

প্রাচীন কালের ইতিহাস কিছু কুজ্ঝটিকায় আবৃত,প্রাচীন মহাত্মাদের জীবনী লীলা-রহস্যের অলৌকিকত্বে পূর্ণ। অলৌকিকত্ব (Miracles) বাদ দিলে তাঁহাদের জীবন-কাহিনী কিছু কিছু নীরস হইয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা কিরূপ ছিলেন, আতিশয্যময় অলৌকিক-রহস্যের আবর্জ্জনা ছাটিয়া ফেলিয়া তাহা বাহির করা কষ্টকর। বুথ আধুনিক কালের জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুগের ঔজ্জ্বল্যে ভূষিত, তাঁহাকে অবতার করিতে কেহই প্রয়াসী নহেন, অলৌকিকত্ব আরোপেরও সম্ভাবনা কুত্রাপি দেখা যায় না, তিনি সরলতার প্রতিমূর্ত্তি,—তিনি প্রেমের অপূর্ব্ব চিত্র। কাজ কর্ম্মে, কথাবার্ত্তায়, চলা-ফেরায় অস্বাভাবিকত্ব কিছুই নাই,—তিনি যেন পাপীর বন্ধু হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া পাপীদের উদ্ধারের জন্য জীবন-পাত করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুধু প্রেম-বলে জগতে যে অসম্ভব সম্ভব করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিয়ত অনুধ্যানের বিষয়। ১৩ বৎসর বয়সের সময় ওয়েসলিয়ান মেথডিষ্টদের প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভ্রমণকারী প্রচারকের কাজ পরিত্যাগ করিয়া, লণ্ডনের ইষ্ট-এণ্ডে (East End) আপন "মিশন" প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল,স্যালভেসন্ আর্মির শাখা ৫৬ দেশে বিস্তৃত হইয়াছে এবং ২১০০০ কর্ম্মচারী তাহার সেবায় নিযুক্ত। ১৯০৩খ্রীঃ যখন পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া তিনি লণ্ডনে

আসিলেন, তখন এস্কুইথ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শ্রেণীর লোক তাঁহাকে অভিবাদন করিল। সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায়, অল্প সময়ের মধ্যে সকল বিরোধী লোকের আন্দোলন তিরোহিত হইল, ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। বর্ত্তমান কালে পৃথিবী ব্যাপিয়া স্যালভেসন আর্মির কাজ চলিতেছে,—এরূপ শৃঙ্খলিত কার্য্য-বিভাগ, দরিদ্রের সেবা

পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই।* স্যালভেসন আর্মির অর্থ জেনেরেল বুথ। একজন লোক পৃথিবীকে কাঁপাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে মানুষ বলিতে চাও, বল; কিন্তু মনে হয়, তিনি যেন বিধাতার প্রকট প্রেম-মূর্ত্তি! তিনি খ্রীষ্টের উপাসক ছিলেন, খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রচার করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। যাহা লক্ষ্য ছিল, তাহা সাধন করিতে তিনি

Disciples of yesterday and to-day

*A comparison is suggested between the report of that wonderful gathering and the account of the first Pentecost in the Second chapter of the Acts of the Apostles,—"Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, in Pontus and Asia, Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews, proselytes" But the map of the world has grown since then The work of the Salvation Army has been carried among nations the Apostles never knew Among those into whose hands the flag of "Blood and Fire" has been borne are Norwegians and Swedes and Icelanders, and the dwellers in Germany, France and Italy, in Finland and Switzerland, in Denmark, and Belgium, Australia and Java, Canada and the United States, South America and the West Indies, Klondyke and Alaska, India and Ceylon, China and Japan South Africa, and the British dominions beyond the seas

Secret of his success

Few people who have listened to General Booth could fail to be shaken to the centre by his simple eloquence There was no touch of vanity about his manner He had the gift of being natural, and his men was a happy blend humorous perception and dignity Simplicity was the keynote of his character and in his straight lean frame one could read the story of the straight clean life-strung

to one purpose, inexorably strained towards one goal, namely, the teaching of Righteousness, Goodness, Love and Perseverance, which were his watch-words

It is interesting to recall General Booth's explanation of the attempts which were made by various religious bodies to take him up General Booth's own explanation was made in the following words,—

"I tried hard to be taken up by two or three religious bodies, but they were afraid They fancied, I suppose, that I should be hard to manage, though I offered to come entirely under their orders if they would leave me to my own methods In after years Dr Benson, the Archbishop, and the Bishop of Durham both saw me, desiring to find some means by which they could comprehend the Salvation Army in the Church, their great notion being not to repeat the mistake the church had already made with John Wesley. I should have all liberty, they assured me; they only wanted some link between the church and the army; but it was too late, the difficulties in the way were too great; besides, how could I have answered for the wishes and opinions of the 14 000 officers who were by that time working under me I could not have got all of them to come with me, so I thought it better to flow on side by side, and help one another when and where we could"

As illustrating the practical nature of the work of the Salvation Army, General